পিয়াপসন্দ

রমাপদ চৌধুরী

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম প্রকাশঃ মাঘ ১৩৬২

প্রকাশকঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকরঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট-শিল্পীঃ
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণঃ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাইঃ ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

আড়াই টাকা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের

দরবারী

প্রথম প্রহর

ঝুমরা বিবির মেলা

নতুন বিয়ের পর কৌতুক আর কথালাপের অনুরাগ ওর চোখে পড়েছে হয়তো, নবদম্পতির হাসি আর আনন্দ মন ভরে দিয়েছে। মনে মনে বলেছে, এ তো আমারই হাতে গড়া, এ সুখাবেশ আমিই সৃষ্টি করেছি। তাই পথে যেতে যেতে কোনদিন কোন পরিচিত স্বামীস্ত্রীকে হয়তো দেখতে পেয়েছে দোতলার বারান্দায়, রেলিঙের পাশে, হয়তো ঘনিষ্ঠতার আবেশ দেখেছে তাদের মুখে চোখে, আর সারা পথ তন্ময় বিহ্বলতার সুর বেজেছে ওর মনে।

কিন্তু, তার চেয়েও ওর ভাল লাগে হাস্যমুখর সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান শিশুর মুখ। বিয়ের দু'পাঁচ বছর পরেও নানা অছিলায় গিয়ে হাজির হয়েছে কোন বাড়ীতে, তরুণী মায়ের ঈষৎ শিথিল বুকের কোমলতায় সোহাগে আঁকড়ে ধরা শিশুসন্তানের এতটুকু প্রগলভ হাসি দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। ও নিজেই বুঝি বুঝতে পারে না, কমনীয় মাতৃত্বের ডানায় ঘেরা একটি ছোট্ট শিশুর হাসি দেখবার জন্যে কেন ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ এক অদ্ভুত তৃপ্তি, অবোধ্য এক নেশা। কিন্তু কেন? কেন তা ও নিজেই জানেনা। কে জানে, হয়তো আত্মগর্ব। এই সরল আর সহজ মাতৃত্ব, এমন অপরূপ সৃষ্টির মূলে হয়তো নিজেরই বিবাহ-দৌত্যের সফলতা দেখতে পায়। তাই।

শিশু দেখলেই কোলে টেনে নিতে ইচ্ছে হয় ওর। ইচ্ছে হয় আদরে আদরে ডুবিয়ে দিতে।

কিন্তু। ও জানে, ওর এই দুর্বল দিকটার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি নেই কারো। ওকে অপয়া ভাবে সকলে, ওর বীভৎস চেহারাটাকে ভয় পায়। বিয়ের পর সবাই যেন এড়িয়ে চলতে চায় ওকে। অথচ বিয়ের আগে কন্যাপক্ষ ওকে ভগবানের আশীর্বাদ মনে ক'রে সাদর আহ্বান জানায়।

সে কথা মনে পড়লেও হাসি পায় কালা ঘটকের। লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে চোখের জল মুছে প্রতিজ্ঞা করে, না, আর কোনদিন কোন বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবে না। অপরের শিশুকে দেখে কি-এমন আনন্দ, কিসের তৃপ্তি!

তবু খবর পেয়ে চুপ করে থাকতে পারে না। চঞ্চল হয়ে ওঠে ছুটে যাবার জন্যে। ঘুমোতে পারে না সারা রাত।

পরপর তিন দিন নিজেকে বেঁধে রাখলে ও। কে যেন খবর দিয়েছিল, হারাণ চাটুজ্যের মেয়ে বুলু এসেছে। একটি সুন্দর ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এসেছে। আসুক, ওদের সঙ্গে সব সম্পর্কতো বিয়ের পরই শেষ

হয়ে গেছে। প্রাপ্য পারিশ্রমিকও পেয়ে গেছে। কেন যাবে ও আবার? না প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা টিকলো না। মনকে প্রবোধ দিলে, আমার আবার লজ্জা অপমান! আর তা ছাড়া, কে বলতে পারে, রক্ষিতদের মেয়ের মত বুলুও হয়তো খুশী হয়ে হাতের চুড়িই একগাছা দিয়ে দেবে।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লো কালা ঘটক। হাতে লম্বা আর মোটা খেরোর খাতাটা নিতে ভুললো না। পুরোনো ছেঁড়া ছাতাটা বগলদাবায়।

—কৈ মা বুলু, ছেলে দেখতে এলাম তোমার। বুলু মা!

চটি চট চট করতে করতে একেবারে দোতলায় উঠে হাঁক দিলো।

ছোট্ট সরল মুখের মেয়ে বুলু, বয়েসে হয়তো ষোলও শেষ হয় নি। তেমনি বোকা বোকা চোখ মেলে একটা ডাঁসা পেয়ারা কামড়াতে কামড়াতে বেরিয়ে এলো বুলু। পরমুহূর্তেই হেসে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে একটু।

—ও মা, আপনি? আসুন।

পান খাওয়া কালো কালো দাঁত বের করে সশব্দে হেসে উঠলো কালা ঘটক। বলল, কৈ ছেলে কৈ? শুনেই ছুটে এলাম, আমার বুলু মা'র ছেলে দেখতে আসবো না?

—বসুন, আনছি। একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো বুলু। পরক্ষণে বললে, দেখি আবার সে দস্যি ছেলে কোথায় গেল। হামা দিতে শেখার পর থেকে কি আর রক্ষে আছে। কখন কোথায় গিয়ে ঘুপটি মেরে বসে থাকে, সারা বাড়ী খুঁজে পাত্তা পাওয়া যায় না।

—যেখানেই থাক্, খুঁজে নিয়ে এসো। তোমার ছেলে না দেখে নড়ছি না আমি।

—না, না। বসুন এক্ষুনি আনছি। ব'লে বেরিয়ে গেল বুলু।

মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এলো, কোলে একটি হাসি হাসি মুখ সুদর্শন শিশুকে নিয়ে, বললে, কি দুষ্টু ছেলে বাবা, সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে মুড়ি খাচ্ছিল।

কালা ঘটক হাসলো ওর কথায়। ভালও লাগলো।

বললে, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে। একেবারে বাপের মত গোলগাল মুখ, আর মায়ের মত রাঙা টুকটুকে গায়ের রঙ। বেশ নাদুসনুদুসটি হয়েছে কিন্তু।

—না, ক'মাস হ'ল একটু রোগা হয়ে গেছে। বুলু প্রতিবাদ করলে।

কালা ঘটক নিজের ভুল বুঝতে পারলো। ছোট ছেলে মোটাসোটা হলেও নাকি তা বলা উচিত নয়। চোখ লাগে। রোগা হয়ে যায়।

তাই শুধরে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, একটু রোগা রোগা মনে হচ্ছে বটে। তবে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে বুলু মা। আর হবে না-ই বা কেন, এ তো এলোমেলো বিয়ে নয়, রীতিমত রাজযোটক করে বিয়ে দিয়েছিল এই শর্মা। হুঁ-হুঁ।

বুলু লজ্জার-হাসি হাসলো। আরো চেপে ধরলো ছেলেকে বুকের কাছে।

কালা ঘটক হাত বাড়ালে হঠাৎ—এসো খোকা, আমার কোলে এসো। এসো, আমার কাছে এসো, রাঙা টুকটুকে বৌ এনে দেবো, ঠিক তোমার মতন। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো ও, চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে কাছে এগিয়ে গেল।

শিশু এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কালা ঘটকের দিকে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে। ও কাছে এগিয়ে যেতেই ভয়ে আশঙ্কায় সশব্দে কেঁদে উঠলো! কাঁদতে কাঁদতে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে গেল বুলু। ওকে রেখে এসে দেখলে ধুতির খুঁটে চোখ মুছছে কালা ঘটক। কি হ'ল। কে জানে, এমনিই হয়তো।

বললে, দিদিমার কোলে গিয়ে তবে ঠাণ্ডা হলেন ছেলে, কি পাজি যে হয়েছে।

হেসে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে কালা ঘটক। বললে, ভয় পেয়েছে।

ভয় সত্যিই পেয়েছিল। সকলেই ভয় পায়। এমন বীভৎস আর কুৎসিত চেহারা দেখে বড়োরাই ভয় পায়। এতটুকু কোলের ছেলে কেঁদে উঠবে না? গায়ের রঙ শুধু কালো নয়, চকচকে। আর বিচ্ছিরি লম্বা, রোগা। বাজপড়া গাছের মত পুড়ে ঝলসে গেছে যেন সারা শরীর। চোখের নীচে দুটো হাড় উঁচু হয়ে আছে চোয়ালের চেয়েও। বসন্তের দাগে সমস্ত মুখখানা ভরে আছে, এমবস্ করা কালো রেক্সিনের মুখোশ পরে আছে যেন। আর তার মাঝে দুটো ধকধকে বড়ো বড়ো চোখ—ঘোলাটে লাল চোখ। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত মনে হয়। এমন বীভৎস চেহারার একটা লোক কাছে এগিয়ে এলে কেঁদে ককিয়ে উঠবে না ছোট ছেলেরা? কালা ঘটক নিজেও তা জানে। তাই, প্রতিজ্ঞা করেছিল

ও, যাবে না কারো ছেলে দেখতে, কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবে না আর। তবু, ঠিক সময়টিতেই ভুলে যায় ও।

বুলুও লজ্জিত হয়েছিল! হাজার হোক, স্বামীপুত্রে সুখী হয়েছে ও। তাই কালা ঘটকের ওপর হয়তো কিছুটা সহানুভূতি ছিল।

সান্ত্বনার সুরে তাই বললে, যা ছিঁচকাঁদুনে ছেলে, কারো কোলে যেতে চায় না।

কালা ঘটকের কালো মুখখানা আরো কালো হ'ল। বললে, না মা, দোষ তোমার ছেলের নয়, দোষ আমার। ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখলেই ভয় পায়। তবু কি যে হয়, কিছুতেই স্বভাবটা শুধরোতে পারি না, মনে থাকে না কিছুতেই।

—না, না, সেকি! দূর, তা না, দাঁড়ান নিয়ে আসছি ওকে, ভয় পাবে কেন।

ছুটে চলে গেল বুলু।

কালা ঘটক শুনতে পেল বুলু বলছে, দাও মা, ওকে নিয়ে যাই, দেখিয়ে আনি।

উত্তর এলো, না, না, ঐ ভালুকটার কাছে ওকে নিয়ে যেতে হবে না। ছেলে যা ভয় পেয়েছে, শেষে অসুখবিসুখ একটা হোক আর কি। যা, যা, ওকে যেতে বলে দে, অত আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না।

শুনলো ও। মনে মনে হাসলো।

একটা গল্প তৈরী করে বুলু ফিরে এলো। কিন্তু কালা ঘটককে আর দেখতে পেল না। আহত, লজ্জিত বোধ করলো বুলু। ছুটে গেল রেলিঙের ধারে, অনুসন্ধানী চোখে তাকালে পথের দিকে। দেখতে পেল দ্রুত পায়ে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কালা ঘটক। চোখের জল মুছতে মুছতে ছুটে গিয়ে মা'র কোল থেকে কেড়ে নিলো ছেলেকে. রাগে আর ক্ষোভে তার পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিলো সজোরে।

ও যে কতখানি কুৎসিত, কতটা কদর্য ওর চেহারা, তখন অবধি জানতো না ও। কালা ঘটক নাম হয়নি তখনও। যেদিন জানলো, সেদিনই বুঝলো যে পিতৃদত্ত নামটাও ওকে ব্যঙ্গ করে।

শ্যামসুন্দর।

কুড়ি বছর বয়েসের বুদ্ধিতে শ্যামসুন্দর এটুকু বুঝেছিল যে ওর চেহারার সঙ্গে এ নামটা একেবারেই খাপ খায় না। কুড়ি বছর বয়েসের

শ্যামসুন্দর! সে সব দিনের কথা আজ আর মনে পড়ে না ওর। অনেক কাল ভুলে গেছে, ভুলে যেতেই চেয়েছে।

কলমিপুর গ্রামের ইস্কুলে তিন তিন বছর ধরে একই ক্লাশে পড়ে থাকতে দেখে হরিধন ঘটক ঠিক করলেন ছেলের বিয়ে দিতে হবে। সংসারী হয়ে সময় থাকতে থাকতে যদি বাপের বিদ্যেটা শিখে নিতে পারে তো কোন রকমে ভাত কাপড়টা জুটে যাবে।

বিঘে দশ বারো জমি, আর একটা ছোট্ট কুঁড়ে। চাষবাস দেখে কিছুটা সুরাহা হবে, বাকিটা পুষিয়ে নিতে পারবে ঘটকালির ব্যবসায়। তাই ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন তিনি গ্রামেরই বৃন্দাবন বাঁড়ুজ্যের মেয়ে উমার সঙ্গে। ন'বছরের মেয়ে, মোটামুটি নাক মুখ চোখে শ্রী আছে। অন্তত কুৎসিত নয়। গায়ের রঙটা একটু কালো, সেদিক থেকে অবশ্য আপত্তি ছিল না, ছেলেও তাঁর কন্দর্প নয়।

কিন্তু পাঁজিপুঁথি দেখে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে হরিধনও উঠলেন আর উমাও গিয়ে ঘরে খিল আঁটলো। বাপ-মায়ের সাধাসাধি অনুনয়বিনয় ভয় দেখানো সব বিফল হ'লো। সেই যে বিছানায় পড়ে কাঁদতে শুরু করলে উমা, সন্ধ্যে অবধি আর উঠলো না।

উমার মা শেষকালে আদরে আব্দারে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন কি হয়েছে বল্। কাঁদছিস কেন?

ন' বছরের উমা মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়লো আবার। কাঁদো কাঁদো রাগত স্বরে বললে, ও যমদূতকে আমি বিয়ে করবো না।

শ্যামসুন্দর শুনলো। গ্রামসুদ্ধ সকলে শোনালো ওকে, হাসতে হাসতে বললে, হায় রে শ্যাম, কালপেঁচির মত মেয়ে উমা, সেও বলে যমদূতকে আমি বিয়ে করবো না।

চেনা অচেনা কেউ ব্যঙ্গ করতে ছাড়লো না। লজ্জায় অপমানে বাড়ীর লোকের সঙ্গেও কথা বন্ধ করলো শ্যামসুন্দর। মুখ তুলে তাকাতেও কষ্ট হ'ত ওর। রাত্রে ঘুম আসতো না। সারা রাত এপাশ ওপাশ করতো। লুকিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতো, আর ইচ্ছে হ'ত চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলতে।

শ্যামসুন্দরের মা বুঝতেন। হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল একদিন, শুনতে পেলেন শ্যামসুন্দর ছট্‌ফট্ করছে বিছানায়। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডেকে তুললেন ছেলেকে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কি হয়েছে তোর? ন' বছরের একফোঁটা একটা মেয়ে কি বললে, তাতে

কাঁদতে আছে. ছিঃ। সবাই কি সুন্দর হয় নাকি, সুন্দর তো লাখে একটা মেলে। অনেক ভাল মেয়ে নিয়ে আসব আমি আমার ঘরে।

মা'র সহানুভূতির স্পর্শে সত্যিই কেঁদে ফেললো শ্যামসুন্দর।

কিন্তু হরিধন ঘটক নিজের ছেলের জন্যে পাত্রী জোগাড় করতে পারল না। পাঁচ পাঁচবার সব ঠিকঠাক হয়ে ছেলে দেখতে এসে বিয়ে ভেঙে যায়। শ্যামসুন্দরের মা বললেন, ভাল ঘর অনেক দেখা হয়েছে, ভাল মেয়ে দেখ। সব চাষা, চামার সব। আমার ঘর চাই না, ভাল মেয়ে চাই।

প্রথম আঘাতটা সয়ে গিয়েছিল শ্যামসুন্দরের. ভুলেও যেত হয়তো। কিন্তু তারপরেই এলো আরেকটা আঘাত।

ছাব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে হ'লো শ্যামসুন্দরের। কল্মিপুর থেকে মাইল আঠার দূরের এক গ্রামে। সত্যিকারের সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে। রূপে যৌবনে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মেয়ে। . হয়তো বংশে কোন কলঙ্ক ছিল, হয়তো বা তার বিধবা মায়ের সতীত্বে সন্দেহ ছিল. তাই বিয়ে হচ্ছিল না মেয়েটির। তারই সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শ্যামসুন্দরের, বাসর কেটে গেল। তবু শুভদৃষ্টির পর আর একটি বারের জন্যেও তার মুখ দেখতে পেল না ও. পেল না একটা কথারও উত্তর। 'প্রথম ওকে দেখলো. ওর মুখ দেখতে পেল বাসরবাত্রির শেষে. আলো-আঁধারিব ভোরে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে কাঞ্চনা। সুন্দর মুখখানা নীল হয়ে গেছে. ফেনা জমে আছে ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে।

লোকে কাঞ্চনার চরিত্রে দোষারোপ করলো। বুড়োরা বললে. প্রণয় যদি ছিলই কারু সঙ্গে তো বিয়ের আগে বললেই পারতো। বুড়িরা বললে. যেমন মা তার তেমনি মেয়ে হবে তো!

কিন্তু শ্যামসুন্দব কিছু বললো না। ও জানে, দোষ কাঞ্চনার নয়। শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলেই কাঞ্চনা শিউরে উঠেছিল কেন. তা জানে ও। কাঞ্চনাব সমস্ত মুখে কিসের ছায়া পড়েছিল তা শ্যামসুন্দর দেখেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাঞ্চনার সে মুখে হতাশা, আতঙ্ক, ঘৃণার ছায়া কেঁপে উঠেছিল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের পিছনে পিছনে শ্যামসুন্দরের চোখ ঠেলে জল গড়িয়ে পড়তে চাইলো। মাথার ভেতব অসহ্য এক ঝিমঝিমানি, ভাবি ভারি ঠেকে সমস্ত মাথাটা। অথচ বুকের ভেতরটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে. অসহ্য এক শূন্যতায় বুক ভেঙে পড়তে চায়। শবীরের সবটুকু শক্তি যেন হারিয়ে গেছে, এতটুকু রক্ত নেই, তেজ নেই।

কাঞ্চনার মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল কাঞ্চনার মা। আর সেই কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কথা কানে এসেছিল ওর। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছিল, ওর নিজের মুখখানা যেন হঠাৎ চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছিল শ্যামসুন্দর। চোরের মত, খুনী আসামীর মত ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে কাটিয়েছে সারাটা দিন। যত দূরেই হোক, মানুষ দেখলেই ভয় পেয়েছে, পায়ের শব্দে গলার স্বরে চমকে উঠেছে। সমস্ত দিন, অর্ধেক রাত্রি ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে মাঠের পর মাঠ পার হয়েছে হেঁটে, আঠার মাইল দূরের গ্রাম কলমিপুর, কলমিপুরে এসে পোঁচেছে। তবু বাড়ী ঢুকতে পারেনি। একদিকে লজ্জা আর আত্মগ্লানি, অন্যদিকে প্রচণ্ড ক্ষিদে আর ক্লান্তি। কিন্তু নিজের বাড়ীতে ঢুকতেও সাহস হয়নি ওর। সারা রাত বাড়ীর চারপাশে ঘুরঘুর করেছে. ছোট্ট এতটুকু একটা মেঠো তিতিরের ডাকে চমকে উঠেছে।

তারপর একসময় ক্ষিদেয় অবসন্ন হয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল ওর। দু' কাঁধের ওপর দুটো কোমল স্নেহের স্পর্শে। ওকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন ওর মা। ঘুম ছুটে গিয়েছিল ওর চোখ থেকে, তবু চোখ বুঁজে রইলো। চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। শুধু অনুভবে বুঝলো, সস্নেহে, সমবেদনার অশ্রু লুকিয়ে মা পাখার বাতাস করছেন এক হাতে, আর অন্য হাতের নরম আর জ্বালাহর আঙুলগুলো কাঁকুইয়ের মত ওর রুক্ষ চুলে বিলি দিচ্ছে।

চুপ করে পড়ে রইলো ও, শান্তিতে সান্ত্বনায়। টপ্ করে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়লো ওর কপালে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ চেয়ে তাকালো ও. স্নেহ প্রীতি ভালবাসায় ভরা মুখখানির দিকে। মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে, কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ও।

শ্যামসুন্দরের বাবা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছিলেন, সব কিছু শুনেছিলেন শ্যামসুন্দরের মা।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন শুধু, তোর আর দোষ কি বাবা। গরীবের ঘরে জন্মেছিস, দুঃখ তো পেতেই হবে।

দিন কয়েক পরে ঐ একই কথা শুনতে পেল ও। পাশের ঘরে

বাবা বলছেন, কপাল গো সবই কপাল। তা না হলে আমার মত গরীবের ঘরে জন্ম হবে কেন।

মা বুঝি উত্তর দিলেন, বাপের টাকার জোরে কত কালপেঁচির বিয়ে ঘটিয়েছ তুমিই কত সোনার চাঁদ ছেলের সঙ্গে, তা কি আর দেখিনি!

শ্যামসুন্দরের বাবাও হয়তো এই আঘাতেই মৃত্যুর দিনটা কাছে টেনে আনলেন। শ্যামসুন্দরের মা তারপরেও দু'বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা কোনদিন ভুলেও মনে আনেননি।

শ্যামসুন্দর মুক্তি পেল। জমিজমা, বাড়ীঘর বিক্রি করে দিয়ে শুধু বাপের লাল খেরো বাঁধানো খাতাটি নিয়ে চলে এলো কোলকাতায়। রামী ধোপানীর গলির এই মেস বাড়ীতে।

সকাল সন্ধ্যে ঘুরে বেড়াত এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী। বগলে ছাতা, হাতে পৌনে একগজ লম্বা লাল খাতা, আর পায়ে চটি। এই নিয়ে সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াত হেঁটে হেঁটে। হয়তো অত্যধিক লম্বা আর রোগা চেহারার জন্যে, হয়তো বা সম্ভবের অতিরিক্ত হাঁটার ফলেই একটু কুঁজো হয়ে পড়লো ও। এমন এক বিচিত্র চেহারা হ'ল যা দুশো গজ দূর থেকে দেখেও চেনা যায়। খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দু-ই জুটলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা উপাধিও। কালা ঘটক। শ্যামসুন্দর নামটাও অনেকে ভুলে গেল।

কিন্তু প্রতিপত্তি যা বাড়ল তা শুধু পোস্ট আপিসের খাতায়, সেভিংসের পাস-বইয়ে। ঐ পচা নোংরা মেস বাড়ীটা ও বদলালো না। পোশাক পরিচ্ছদেও এলো না কোন পারিপাট্য। ও-সবে বুকের গভীরে ক্ষতচিহ্নটা হয়তো লুকোনো যায় অপরের চোখের আড়ালে, কিন্তু নিজের কাছ থেকে নিজেকে লুকোবে কি করে! কালো কারে বাঁধা চ্যাপটা দোয়াত আর শরের কলমটাকে শুধু বিদায় দিলো ও। একটা কমদামী ভাঙা ফাউণ্টেন-পেন, মাথার হারানো ক্যাপটার বদলে মোটা কঞ্চি ফোঁপড়া করে নিয়ে কাজে লাগানো। এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। না চেহারায়, না ব্যবহারে।

এই পচা নোংরা গলির ভাঙা মেসে থাকার অবশ্য একমাত্র কারণ ওর কার্পণ্য নয়। আর আর বাসিন্দেরা হয়তো তাই ভাবতো! আসলে যেতে আসতে গলির মুখে চোখ পড়তো রামীর ওপর। বছর পনর বয়সের ধোপাদের মেয়ে রামী গোলগাল টুলটুলে মুখ, মিষ্টি দু'খানি ডাগর

বুকে। সারা রাত বিছানায় ছটফট করে কাটাতে হয়। ঘুম নামে না শ্যামসুন্দরের চোখে। শুধু স্বপ্ন দেখে, কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

শুধু একটি দিন। ক্লান্তিময় দিনের গায়ে একটি মাত্র স্নিগ্ধ সকাল যেন। রাঙতায় মোড়া রাতের মত উজ্জ্বল আর রোমাঞ্চমধুর। অতি-রোমন্থনে তাও যেন মিলিয়ে গেছে স্বপ্ন হয়ে। শুধু একটা ভুলে যাওয়া গানের রেশ বেজে ওঠে ওর কানের পাশে, থেমে যাওয়া নূত্যনূপুর বুঝি বা বুলি বুলোয় থেকে থেকে।

তখন সবে এ শহরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শ্যামসুন্দরের। গলি-ঘুঁজি হালচাল তখনও ঠিক মত জানা হয়নি। লাল শালুতে বাঁধানো লম্বা খাতাখানার মাত্র কয়েকটা পাতায় কালির আঁচড় পড়েছে।

মালার মত সরু মরাগাঙের বুকে ছোট্ট একটা সাঁকোর মত ব্রিজ, পার হবার আগেই ডান দিকে একটা গলি। প্রস্থে স্বল্প হলেও দৈর্ঘ্যে সীমানা নেই। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে। গঙ্গার ধারে ধারে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। ছোট আঁকাবাঁকা রাস্তা, জলে কাদায় নোংরা হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, পীচের আবরণ আছে কি নেই বোঝা-ই যায় না। মাঝে মাঝে খোলা হাইড্রেন্ট থেকে ফুটন্ত কেৎলির মত জল উথলে পড়ছে অনর্গল, দু'চারটে কাদামাখা মোষ আর ঠেলাগাড়ি বেওয়ারিশের মত পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে। গঙ্গার ধারে ইঁটের পাঁজা, চুন সুরকির দোকান। বাঁশ কাঠ আর করগেটের গুদাম। রাস্তার এ-পারেও কয়েকটা টিনের শেড, তারপর বাখারি দিয়ে ঘেরা একটা বস্তি—ছিটেবেড়ার দেয়াল, লম্বা গেলাসের মত মেঠো টালির ছাদ।

বগলে ছাতা আর হাতে খাতা নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছিল শ্যামসুন্দর। হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, নামলো তুমুল বৃষ্টি। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। শেষ ভাদ্রেই কাঁচা সোনার রোদ মুছে গেল হঠাৎ, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার তোড়ে শুরু হ'ল ধারাবর্ষণ। আর ঝড়। একদিকে প্রবল বৃষ্টি, অন্যদিকে ঝড়ের দাপট। তার ওপর বিদ্যুতের চমক আর মেঘের নিনাদ। ছাতাটা খুলে কয়েক পা এগিয়েছে শ্যামসুন্দর, অমনি দমকা বাতাসে ছাতাটা হ'ল হাতছাড়া। রাস্তার পাশেরই একটা খোলা দরজার দিকে ছুটে গেল শ্যামসুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে কাদায় পিছলে গিয়ে পড়লো একেবারে মেয়েটির গায়ের ওপর। তার আগে হয়তো লক্ষ্যও করেনি শ্যামসুন্দর, নরম গলার ধমক শুনে চোখ তুলে তাকালো। সুসজ্জিতা

একটি মহিলার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ও, এ কথা বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শ্যামসুন্দর। কিন্তু তার আগেই চীৎকার শুরু হয়ে গেছে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলে শ্যামসুন্দর। কিন্তু প্রৌঢ়াটির চীৎকার যেন আরও বেড়ে গেল। লোক জমা হয়ে গেল ক্রমশ। তারপর, তারপর আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না শ্যামসুন্দরের। শুধু প্রচণ্ড প্রহারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কাতর অনুনয় বিনয় করেছিল ও হাতে পায়ে ধরেছিল প্রত্যেকের। কিন্তু এতটুকু দয়াও কেউ দেখায় নি। কপালের রক্ত লেগেছিল ওর হাতে, আর সেই রক্ত দেখেই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল ও।

জ্ঞান হওয়ার পর চোখ মেলে তাকিয়েই দুটি ব্যথা কাতর সজল চোখ দেখতে পেল শ্যামসুন্দর। সমস্ত শরীরে ওর অসহ্য যন্ত্রণা, মাথাটা ভার ভার। কপালে হাত দিয়ে দেখলে কাটা জায়গাটা কাপড় দিয়ে বাঁধা। বিস্ময়ে চোখ মেলে তাকালো শ্যামসুন্দর।

একটি সুন্দর মুখ। চিকণ কালো মুখ, নিটোল গালে লাবণ্যের আভা। আর এই নিকষ কৃষ্ণছায়ার মাঝে দুটি গভীর কালো চোখের মাধুরী। বেদনার্ত, স্নেহস্নিগ্ধ। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখলে শ্যামসুন্দর, অনুভবের দৃষ্টিতে তাকালো। সাদা ধবধবে একটা শাড়ী পরেছে মেয়েটি, কালো দেহের কালিমা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আরো। তবু, কি প্রশান্তি কতখানি মুগ্ধমমতার আবেশ ঐ চোখে।

মাথার কাছে বসে পাখা নেড়ে বাতাস করছিল মেয়েটি।

শ্যামসুন্দর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করলে, তুমি- তুমি কে?

স্নিগ্ধ বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে উত্তর দিলো মেয়েটি, অত্যন্ত সহজ স্বরে।— আমি রাঙি। মাথায় ব্যথা লেগেছে আপনার? যন্ত্রণা হচ্ছে?

অভিভূত ভাবে শ্যামসুন্দর বললে, না তো!

আবার সেই সুমিষ্ট হাসি হাসলে মেয়েটি। শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাঁ হাতের আঙুলগুলো ওর চুলের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, চোখ বুজুন, চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। কিছু হয়নি, এখনি সেরে যাবে।

সত্যিই চোখ বুজলো শ্যামসুন্দর। রাঙির প্রত্যেকটি কথা যেন আদেশ

—আপনাকে ডাকছে যে! ভয়ে ভয়ে ছেলেটি বললে।

সন্ত্রস্ত চোখে তাকালো ও।—কে?

—ঐ ও বাড়ীর রাঙিমাসিমা।

—কে? কে রাঙিমাসিমা? নামটা ভুলে যায়নি ও, কিন্তু ঠিক এই পল্লীতে রাঙিকে হয়তো আশা করতে পারে-নি। তাই, ভেবেছিল কেউ হয়তো ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্যেই ওকে ডাকছে।

ছেলেটির আঙুল লক্ষ্য করে চোখ ফেলতেই রাঙিকে দেখতে পেল ও। ভিজে ভাঙা কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাঙি। কপাল অবধি ঘোমটায় ঢাকা।

কাছে এগিয়ে এলো শ্যামসুন্দর। রাঙির চোখ যেন ওকে হাতছানি দিচ্ছে। ঘোমটাটা আরো একটু টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকলো রাঙি, পিছনে পিছনে শ্যামসুন্দরও। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ও, ভেবেছিল রাঙি হয়তো ভুলে গেছে, একটি রাত্রির ভুল মুছে ফেলেছে ওর জীবন থেকে।

শ্যামসুন্দরের মনে হ'ল, রাঙি যেন অনেক বড়ো হয়েছে, বয়েস বেড়ে গেছে যেন বছরের হিসেব পার হয়েও। সেই শুচীশুভ্র বৈধব্যের বেশবাস তুচ্ছ করে কোথায় যেন একটা প্রাচুর্যের ছন্দ দোল খাচ্ছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছিল শ্যামসুন্দর। ভাবছিল, তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ একটা শব্দে চোখ তুললে। পরক্ষণে বিস্ময়ে চমকে উঠলো ও।

রাঙি। ফিরে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রাঙি। কোলে তার একটি বছর দুয়েকের ছোট্ট শিশু। মিটিমিটি ঠোঁট টিপে হাসলো রাঙি। মাতৃত্বের স্নেহে আঁকড়ে ধরলো ছেলেকে।

আশ্চর্য।

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলো শ্যামসুন্দর। এত কুৎসিত, এমন বীভৎস চেহারার কোন শিশু ও দেখেনি এর আগে।

পুরোনো দিনের কয়েকটা দৃশ্য ভাসা ভাসা মনে পড়লো। চোখের সামনে ফুটে উঠলো না, মনের কোণে উঁকি দিলো না কোন স্পষ্ট আভাস। তবু, ভালো লাগা আর ভুলে যাওয়া কোন গানের সুরের মতই অনুভূতির তারে কি এক ক্ষীণ অনুরণনের রেশ যেন। রাঙি। সেই মুখ আর মোলায়েম চোখ, সেই অশ্রু উজ্জ্বল নিটোল মুখ, [illegible] শীর্ণকটি শরীরের প্রতিটি রেখাতরঙ্গে যৌবনের পূর্ণিমা। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি স্নিগ্ধসুন্দর। [illegible] যা [illegible] সুপ্রকাশিত, [illegible] স্বতঃসম্পূর্ণ।

কিন্তু ঐ শুচিশুভ্র বৈধব্যের শ্বেতাবরণ, ঐ অপার্থিব রূপকে যেন ব্যঙ্গ করছে একটি কুৎসিত শিশুর মসীময় কৃষ্ণাঙ্গ।

প্রথম দৃষ্টিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলো শ্যামসুন্দর। শৈশবের আয়নায় নিজেকে দেখলো যেন ও। মুখে চোখে আকস্মিকতার ছায়া নেমেছিল ওর, সেটুকু চাপা দেয়ার জন্যে মুখে হাসি আনলে। রাঙির স্মিতহাস চোখের পাতা বুঁজে এলো, ঠোঁট টিপে খুশিতে হেসে উঠলো ও।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শ্যামসুন্দর।

ক্রমশ। ক্রমশ শ্যামসুন্দরের মনে হ'ল—না, কুৎসিত নয়, এ শিশুও সুন্দর। ওকে কোলে নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো শ্যামসুন্দরের হাত দুটো, চঞ্চল হয়ে উঠলো ও।

অনেকগুলো ঘটনা পর পর মনে পড়ে গেল শ্যামসুন্দরের। মনে পড়ে গেল, ও নিজে কুৎসিত, ওর বীভৎস চেহারা দেখে ছেলে মেয়েরা ভয় পায়। 'ঐ অপয়াটার কাছে ছেলে নিয়ে যেতে হবে না'; 'ঐ ভালুকের মত চেহারা দেখলে ভয় পাবে না এক ফোঁটা মেয়ে'। না, অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছে শ্যামসুন্দর, প্রতিজ্ঞা ভুলে যাওয়ার জন্যে আঘাত পেয়েছে প্রতিবারই। আর ভুল হবে না, ভুলে যাবে না ও।

কিন্তু, এ যে ওর নিজেরই ব্যর্থজীবনের একমাত্র রোমাঞ্চময় সৃষ্টি। কোলে নেবে না? বুকে টেনে নেবে না ওর প্রাণাংশকে, স্মৃতিচিহ্নকে!

নিজের অজান্তেই হাত বাড়ালে শ্যামসুন্দর। শিশুকে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রগলভ হাসিতে খিলখিল করে কৌতুকে গড়িয়ে পড়লো ছেলেটি। তারপর, তারপর ছোট ছোট দুটি নরম হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো শ্যামসুন্দরের কোলে। আনন্দে উন্মাদনায় সশব্দে হেসে উঠলো শ্যামসুন্দর, সজোরে আঁকড়ে ধরলো। সবল আর দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

এ যেন স্বপ্ন দেখছে শ্যামসুন্দর, কল্পনার রঙে রামধনু আঁকছে যেন। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হবার নয়।

ওর চোখের হাসি ধীরে ধীরে রাঙির চোখে তৃপ্তির শিহরণ দিলো। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে, শ্যামসুন্দরের তৃপ্তিময় চোখের দিকে, আপন সন্তানের দিকে।

[১৩৫৭]

অ ঙ্গ পা লি

মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা। ফিরে আসতে হ'ল। এক যুগ পরে। হিসেবে হয়তো বেশি দিন নয়, দেড় বছর কি আরো কম সময়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যেই ঘটে গেল কত পরিবর্তন।

কালো আকাশের অন্ধকার চিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিল দিকে দিকে। আর চীৎকার। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ ভেসে উঠেছিল আকাশে বাতাসে! মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সবিতার। হঠাৎ-জাগা চোখে ভয় নেমেছিল ওর। বাবা মা ভাই বোন সকলের মুখের ওপর দেখতে পেয়েছিল ও শঙ্কিত বিস্ময়ের ছাপ! ধোয়া চাদরের মত ফ্যাকাশে মুখে অপেক্ষা করেছিল ওরা। অপেক্ষা, অপেক্ষা। তারপর। পশুর মত চোখে আর প্রেতের মত শরীর নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তারা। সেই ছায়া-কালো-কালো মানুষগুলো। বাইরে শুধু অন্ধকার আর কালির বৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টির রিমঝিম রিমঝিম ছাপিয়ে ভেসে আসছিল ক্রুদ্ধ জনতার ম'দো রক্তের চীৎকার। ওরা এগিয়ে এলো। কারো হাতে মশাল. কেউ বা কৃপাণপাণি। তারপরও কি যেন ঘটেছিল। ভাল করে মনেও পড়ে না সবিতার। হয়তো বা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল ও। বোবা আর বোকা চোখ চেয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখেছিল। রক্ত আর রক্ত।

বাবা, মা, ভাই, বোন। কতদিন, কত কর্মহীন বিষণ্ণ দুপুর কাটিয়েছে ও ভেবে ভেবে, কত না নিঘুম রাত! তারা কি বেঁচে আছে? সবিতার জীবন থেকে অন্তত মুছে গেছে তারা। কে জানে, ওকে বাদ দিয়েই হয়তো নানা রঙে রাঙিন হয়ে উঠেছে ওদের সংসার। বংশের সাদা ফুটফুটে পাখনাটার ওপর যে কালির চিহ্ন পড়েছিল সেটুকু মুছে ফেলে আবার হয়তো নতুন সংসার গড়ে তুলেছে ওরা। সবিতাকে ভুলে গেছে। সবিতাও ভুলতে চেষ্টা করেছিল ওদের। কি হবে মিথ্যে

দুঃখ করে। ব্যর্থ অনুশোচনায়। হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করলে, মাতৃত্বের স্নিগ্ধাবেশে ওর দেহ ভরে উঠেছে। চোখে মধুময় ক্লান্তি। অবাঞ্ছিত, অযাচিত হতে পারে। স্নেহ আর ভালবাসা নয়, ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিনিময়ে পাওয়া সন্তান। তবু। সব অপরাধ যেন ক্ষমা পেল সবিতার কাছে। ওর আপন দেহের রক্ত মাংসে গড়া সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলবার চেষ্টা করলে ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

এমন সময় ডাক এসে পৌঁছলো। পুলিসের সাহায্যে কারা যেন উদ্ধার করলো ওকে।

তারপর।

আট মাসের শিশুটিকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ দেহ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সবিতা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পাথরের মূর্তির মত।

ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের মত সশব্দে চলে গেল পুলিশের গাড়ীখানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে তাকালো ও মা'র মুখের দিকে। পরক্ষণেই মাথাটা ঝুঁকে পড়লো ওর, চোখ নিবদ্ধ হ'ল পায়ের দিকে। মুখ তুলতেও কেমন এক অস্বস্তি।

—আয়।

ছোট্ট একটি অভ্যর্থনার ডাক। হয়তো আন্তরিক, হয়তো বা উপায়হীন। সবিতা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। আরেকবার চকিতে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, মা'র চোখে চাপা কান্নার অশ্রু।

পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল সবিতা।

কপাটে ঠেস দিয়ে ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে আছে ছোট বোন কবিতা। এগার বছর বয়সের মেয়ে, কিছুই চেনে না, কিছুই বোঝে না, তবু কেমন এক অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। ওর দিকে তাকিয়ে বিষন্ন হাসি হাসলে সবিতা।

কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও। কি বলবে, কি-ই বা প্রশ্ন করবে? তার চেয়ে একেবারে চুপচাপ থাকা ভাল। কথা বললেই তো পাশ থেকে একটা কথাই খোঁচা দেবে। মনে পড়বে, মনে পড়িয়ে দেবে ওর অতীতের গ্লানির দিনগুলোকে।

মা বললে, বোস, এখানে। আর নয়তো যা কলঘর থেকে হাত মুখ ধুয়ে আয়। জিরিয়ে নে একটু। আমি জল খাবারের ব্যবস্থা করি গে।

নিজের মনেই হাসলে সবিতা। উত্তর দিলো না। লজ্জা আর অস্বস্তি ওর একার নয়। মা ওর চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চায়, সরে থাকতে চায়।

মা চলে যেতেই কবিতাকে কাছে ডাকলে ও।

মৃদু হেসে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো।—কেমন আছিস?

কবিতা ঘাড় নাড়লে. অর্থাৎ ভালই।

—বাবা?

ছোট্ট একটি কথা। কি অর্থ ওর? যে কোন অর্থ ধরতে পারে কবিতা। বাবা কোথায়, বাবা কেমন আছেন! কিংবা, বাবা আছেন কি?

চমকে চোখ তুললে কবিতা। সবিতা বিষণ্ণ হাসি হাসলে।—ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার প্রশ্ন করলে, বকু? বকুও নেই?

—দাদা কলেজে গেছে।

যাক।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সবিতা। জোর করে হাসলে, খুশিতে নেচে ওঠবার চেষ্টা করলে। মিলেমিশে যেতে হবে। ঠিক আগের দিনের মতই। হয়তো অস্বাভাবিক মনে হবে ওর ব্যবহার, চোখে লাগবে। তবু, মাঝখানের দেয়ালটা সরিয়ে ফেলতে হবে। দূরে দূরে থাকলে দূরের মানুষ হয়ে যাবে ও। সে আরো কষ্টকর, অসহ্য।

হাসিখুশি মুখে কোলের শিশুর গাল টিপে আদর করলে সবিতা, চুমু খেলো।

হাসতে হাসতে বললে, ড্যাবড্যাব করে দেখছিস কি দুষ্টু? চিনিস, একে চিনিস তুই?

কবিতাও হেসে হাত বাড়ালে। ওর কোলে ছেড়ে দিলো ও ছেলেটাকে। তারপর ছেলেকে আদর করতে করতে কবিতাকে জড়িয়ে ধরলো। যেন ওর ছেলেকেই আদর করছে সবিতা। বাঁ হাতটা কবিতার কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে শিশুর চুলে বিলি দিতে শুরু করলে। কবিতার পিঠের ওপর বুকের চাপ পড়লো ওর। কবিতা বুঝলো না। ছোট ছেলেপিলে দেখলেই মেতে ওঠে ও। এতো দিদির ছেলে! সবিতার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল, খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কবিতাকে জড়িয়ে ধরতে। বুকের কাছে টেনে আনতে চায় ও কবিতাকে। এতদিন পরে আবার আপন ক'রে, অন্তরঙ্গভাবে ফিরে পেয়েছে ও ছোট্ট বোনটিকে! খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর।

হঠাৎ মা'র পায়ের শব্দে মুখের হাসিটা ওর থমকে গেল। চট করে ছেলেকে কোলে তুলে নিলো ও। এত রঙ, এত রসিকতা, এত আনন্দ হয়তো মার চোখে দৃষ্টিকটু লাগবে।

মা এসে দাঁড়ালো একটু পরেই।

শিশুর দিকে আবার হাত বাড়িয়ে কবিতা বললে, কি সুন্দর চোখ দুটো দেখো মা। কেমন দুষ্টুমির হাসি দেখছো?

খুশির ছোঁয়াচ লাগলো হয়তো, মাও হাসলো।

কবিতা জিগ্যেস করলে, কত বয়স হ'ল দিদি এর?

সবিতা উত্তর দিলো না প্রথমবারে। মার সামনে ওর কেমন এক অস্বস্তি।

কবিতা আবার প্রশ্ন করলে।

উত্তর এলো, শুকনো উত্তর। —আট মাস।

—ও মা। মাত্র আট মাস! কি ভারি বাবা, কোলে রাখা যায় না। কেমন নাদুসনুদুসটি হয়েছে, না মা? আমি ভেবেছিলাম এক বছর দেড় বছর হবে।

মা বা দিদির কাছ থেকে কোন কথা যে শুনতে পেল না ও, কবিতার সেদিকে লক্ষ্যই নেই। ও কথার পর কথা বলে চলেছে।

—কি নাম রেখেছো দিদি?

—নাম নেই। শুকনো গলায় উত্তর দিলো সবিতা।

অর্থাৎ, নাম যেটা আছে, সেটা বলা চলে না।

কবিতা এদিকে বিস্ময়ে চোখ গোল করলে, নাম দাওনি এখনো? কেমন হাসিখুশি দেখছো মা। আচ্ছা, কি নাম দেবে বলতো? হয়েছে, ওবাড়ীর বৌদি নাম দিয়েছে হাসি, এর নাম দেবো খুশি। খিল খিল করে হেসে উঠলো কবিতা।

তারপর শিশুর দিকে তাকিয়ে বললে, হাসির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো বুঝলে খুশি? রাঙা টুকটুকে দেখতে। কাল আনবো, দেখো।

সবিতা গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করছিল। তবু পারলে না। ক্রমে ক্রমে একটা হাসি ফুটে উঠছিল ওর চোখে।

মা বললে, যা সবি, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

কবিতা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললে, কেমন দিদিমা বাপু তুমি; নাতিকে কোলে নিলে না সেই থেকে!

মা হেসে হাত বাড়ালো।

কলঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল সবিতা। দোরের আড়াল থেকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, মা কোলে নিলো ওকে।

সবিতার বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। ঘুঙুরের বোল ফুটলো বুকের মধ্যে।

স্নান সেরে এসে সবিতা দেখলে খুশি তখনো মার কোলে। কবিতা কাড়াকাড়ি করছে, কিন্তু না, মা কিছুতেই দেবে না।

ঠোঁট টিপে টিপে হাসলে সবিতা। চোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখলে।

মাকে ওর ভয় ছিল। মার শুচিবাই ওর অজানা নয়! তাই আশঙ্কা ছিল। পুলিস যখন ওকে উদ্ধার করতে যায়, হাত-পা ধরে অনুনয় করেছিল ও। বলেছিল, আমি তো বেশ সুখেই আছি, ফিরে যেতে চাই না। আর ফিরে গেলেই বা মা বাবা আমাকে ফিরে নেবেন কেন? আমার জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি তাদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেছি।

ওরা শোনেনি। আইন—আইনের দোহাই পেড়েছিল। মা-বাবা গ্রহণ না করলেও, অনাথ আশ্রম আছে সে ভরসা দেখিয়েছিল।

সে কথা ভেবে সবিতার হঠাৎ মনে হ'ল মাকে সে চিনতো না। আজই প্রথম চিনলো যেন।

মানুষ কত বদলে যায়। সবিতা ভাবলে। মনে পড়লো ছোট বেলাকার কথা। ইস্কুল থেকে ফিরে কাপড় না ছাড়লে মাকে ছুঁতে পেত না ও, ঘরের জিনিসপত্তরে হাত দিতে পেত না!

সবিতা এবার মুখ খুললো। —একটু চা করে দিবি কবি?

মা ফিরে তাকালো। —বস্, খাবার নিয়ে আসছি।

মা চলে গেল খাবার আনতে।

বিকেলের রোদ কমে এসেছে তখন। রাতের ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। বই বগলে বকু ফিরে এলো। —দিদি তুই?

—হ্যাঁ, আমি। সবিতা হাসলে। বললে, ভূত ভেবেছিলি বুঝি?

বকুও হাসলো। বললে, আমরা ভেবেছিলাম, তুই মরে গেছিস।

—তা হলেই ভাল হ'ত, না?

—দূর। মরে কোন আরাম নেই।

সবিতা হেসে বললে, পড়াশুনা করছিস আজকাল, না আগের মতোই?

বকু উত্তর দিলে, এতো আর ইস্কুল নয়। কলেজে ভর্তি হয়েছি। না পড়লে চলে?

—তাই বুঝি? সবিতা হাসলে।

কবিতা ফোড়ন কাটলে, পড়ে না ছাই। শান্তদার সঙ্গে আড্ডা দেয় দিন রাত।

—দিই তো দিই। কবিতাকে ভেংচি কেটে বই রাখতে গেল বকু।

আর জলযোগ সেরে বারান্দার ডেকচেয়ারটাতেই শুয়ে পড়লো সবিতা। সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদে সারা শরীর টনটন করছে। তাছাড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে সবিতা। চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢলে পড়লো।

সন্ধ্যা নামলো। বাতাস থামলো। তারাজ্বলা অন্ধকারের আকাশে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো চাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার ফাঁকে কোথায় একটা কাক বসে পাখা ঝটপট করছে। চিঁচিঁ শব্দ তুলে কয়েকটা চামচিকে উড়ে গেল।

সবিতা শুনতে পেল না। দেখতে পেল না। ঘুমের ঘোরে ওর মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

বার কয়েক এসে ফিরে গেল কবিতা আর বকু। বসে বসে গল্প করবার সাধ ওদের। অনেক, অনেক কথা শোনবার আছে। বলবার আছে। দেড়টা বছর যেন একটা যুগ। কত কি ঘটে গেল, কত কি বদলে গেল। সে সব কি শুনবে না ওরা, বলবে না? কিন্তু। না, শ্রান্ত দেহ মন সবিতার। ঘুমুক ও। ঘুম ভাঙাবে না ওরা। ঘুম তো ভাঙবেই, নিজের থেকেই জেগে উঠবে একসময়।

কি একটা শব্দে চোখ খুললে সবিতা। উঠে বসলো।

রাত ঘন হয়ে এসেছে। নির্জন নিশ্চুপ রাত। সামনের রাস্তাটার দিকে তাকালে সবিতা। দূরের আর অদূরের বাড়ীগুলোর দিকে। আকাশের দিকে।

চাঁদের গায়ে কুয়াশার মত স্বচ্ছ মেঘের ওড়না। নীচের রাস্তাটা চকচকে ইস্পাতের মত পড়ে আছে, নির্জন। এবাড়ী ওবাড়ীর দু' একটা জানালায় এখনো আলো জ্বলছে।

উঠে দাঁড়ালো সবিতা। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ও নিজেই কি গিয়ে জল গড়িয়ে নেবে? না, কবিতাকে ডাকবে?

হাল্কা পায়ে একটু পায়চারি করলে সবিতা। বারান্দাতেই খুশি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকটা শিরশির করছে যেন। দুধ খাওয়ানো হয়নি খুশিকে। নাকি, বোতলের দুধ খাইয়েছে ওরা।

ঘরগুলো অন্ধকার। ভেতরের উঠোনে এক ফালি আলো।

আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতর পা বাড়ালে ও।

খানিকটা এসেই থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কপাটের আড়ালে।

ভিজে কাপড়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বকু।

বকু বললে, এমনি অসুখ তোমার, আবার এত রাতে চান করলে?

মা লজ্জিত হয়ে বললে, কি করবো বল্। সারাটা দিন ছেলেটাকে নিয়ে মাখামাখি করলাম।

—করলেই বা। অবোধ্য অভিমান বকুর গলায়।

মা মুখে বললে, কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু!

[১৩৫৬]

জ্বালাহর

নিশুতি রাত নয়, রাত সাড়ে দশটা, কিংবা কে জানে এগারোটাও হতে পারে, যখন আর কি সব বাড়ীর আলো নিভে যায়, চারিদিক চুপচাপ, ল্যাম্পপোস্টগুলো ঘুমে ঢুলতে থাকে, থেমে যায় উঠোন ধোয়ার সপ্‌সপ্‌ শব্দ, অসাবধানী ঝিয়ের হাতের বাসন গোছানোর ঠুং ঠাং বা ঝনঝনানি আর বাজে না, যখন কচি ছেলের মা কাঁচা ঘুমের কান্না থামাতে ছেলেকে ঘুম-ঘুম চোখে দুধ খাওয়ায়, বুকের নয়তো বোতলের, যখন কিনা অনেক অন্ধকারের ওড়নায় পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়ে, আতঙ্কিত কালো রাতের পথে অজানা রহস্যের পদধ্বনিটুকুও শোনা যায় না, ছাদের কার্নিসে আর রাস্তার মোড়ের শিশু গাছের আড়ালে চোরা বিশ্রম্ভের অভিসারআলাপ ফিসফিস করে না, যখন আশ্লেষশয়না নব দম্পতির অধরে ওষ্ঠে ঘটে মিলন, রাত মজে আসে যখন. তখন হয়তো কাঁকুলিয়ার সড়ক ধরে যেতে যেতে আপনি মেয়েলী কণ্ঠের একটি তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন।

সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটি নরম কণ্ঠের ব্যথাহত চীৎকার হয়তো শুনেছেন আপনি। এ পথের যে কোন হঠাৎ-পথিকের কানেই এ কান্না বেজে ওঠে। বাতাস থমকে থেমে পড়ে এই মুহূর্তে, রাস্তার আলোর সারিও হয়তো চমকে চোখ তোলে, আর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস একটি মেয়ের সারা বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে।

সেদিন দূরের ট্রাম ডিপোর ঘণ্টা তখনো এগারোটা বাজার সঙ্কেত জানায় নি। আর পড়শীদের চোখে তন্দ্রা ঘন হয়ে ঘুম হয়নি।

হ্যাঁ। চাঁদ ঢলে পড়েছিল। বাতাস বিলি দিচ্ছিলো গাছ-গাছালির গায়ে। পাড়ার শেষ-জাগরী পরীক্ষার পড়া-পড়ুয়া মেয়েটাও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে তখন।

জানালার পর্দাটা সরিয়ে, গরাদের ফাঁকে গাল চেপে অপেক্ষা করছিল শ্যামলী। থমথমে অন্ধকারে শ্যামলীর বোবা যৌবন প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলো।

ইন্দ্রনাথ।

অদূরে যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল শ্যামলী। আশায় আশায় চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, রাস্তার মোরম মাড়িয়ে কে যেন আসছে। ভারি পায়ের জুতোর শব্দ শুনতে পেল ও। এক টুকরো মরা হাসির বিদ্যুৎ যেন দেখা দিল ওর মুখে, একটি মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর চোখ।

ইন্দ্রনাথই।

দোরের দিকে ছুটে গেল শ্যামলী। তার আগেই অধৈর্য্য হাতের কড়ানাড়ার আওয়াজ বেজে উঠেছে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে ও। ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলো। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ। নাকে আঁচল চেপে কপাটে খিল দিলে শ্যামলী। তারপর ইন্দ্রনাথের ভারি চেহারার পেছনে পেছনে এসে ঘরে ঢুকলো।

আলোটা জ্বললো, নিভলো।

তারপরেই করুণ কাকুতি-ভরা ভীতচকিত চীৎকার!

শিউলির দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেল সুরঞ্জন। চোখ না চেয়েই মৃদু ভাবে শিউলির পিঠের ওপর হাতটা রাখলো। সান্ত্বনা। সহানুভূতি।

সুরঞ্জনের হাতটা আঁকড়ে ধরলো শিউলি। কান্নায় কাঁপছে ও, সুরঞ্জন বুঝতে পারলো। তবু। উপায় কি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ যেন ফুঁপিয়ে উঠলো শিউলি। গলার স্বর শুনে তাই মনে হ'ল সুরঞ্জনের।

—এর একটা বিহিত করতেই হবে। মরে যাবে মেয়েটা।

আজ নয়, কাল নয়। প্রতিদিন। ঐ একই ঘটনা ঘটে আসছে। আর শিউলির বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘশ্বাস।—একটা বিহিত করতেই হবে। কিন্তু ও কি করতে পারে? কি করতে পারে ওরা!

শিউলি বলেছে, এ নরকে থাকা কেন তোর। বাবার কাছে চলে যা, শ্যামলী।

শ্যামলী হেসেছে।—কোথায় যাবো! পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু হয়ই!

শিউলি চটে গেছে, বলেছে, তুই আর আমাকে পুরুষমানুষ চেনাস না, তোর দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছে আমার।

হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে শ্যামলী। ব্যথার হাসি হাসে। অর্থাৎ

ইন্দ্রনাথ আর সুরঞ্জন, তফাৎটা নতুন করে চোখে পড়ে। শিউলিও বুঝতে পারে। অজান্তে আঘাত দিয়ে ফেলেছে শ্যামলীকে।

সান্ত্বনার সুরে বলে, ওকেই বা দোষ দেব কি। দোষ তো ওর নয়, দোষ নেশার।

শ্যামলী হাসে।—না দিদি, আমার অদৃষ্টের।

এরপর আর কি বলবে শিউলি। কথাটা তো মিথ্যে নয় যে প্রতিবাদ করবে! তাই ফিরে এসে সুরঞ্জনকে ধরে, আমার কথায় ও কান দেয় না। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।

শিউলির ছোট বোন শ্যামলী। তার সঙ্গে সুরঞ্জনের সম্পর্ক সুখের, আনন্দের। আমোদমৈত্রীর। ব্যথার, ব্যর্থতার কথা তার সঙ্গে আলোচনা করবে কি করে সুরঞ্জন।

—তবে চলো, আমরাই উঠে যাই কোথাও। অভিমান করে শিউলি।

সুরঞ্জন হাসে। ও জানে, শিউলি তা পারবে না। ইন্দ্রনাথ যখন এখানে বদলি হয়ে এলো, তখন থাকার জায়গা পায়নি সে। বাসা খুঁজে পায় নি। শিউলি, শিউলিই তো তখন জোর করে ডেকে আনলো ইন্দ্রনাথকে। সুরঞ্জনকে বললে নীচের তলাটা এমনি পড়ে থাকে, না হয় আমার বোনকেই ভাড়া দিলে।

সুরঞ্জন বলেছিল, শোনো শ্যামলী, দিদিটি তোমার কি স্বার্থপর। নিজে বিনা ভাড়ায় রয়েছে আর তোমার কাছ থেকে ভাড়া নিতে বলছে।

শ্যামলী কিন্তু রাজি হয় নি। ভাড়ার অঙ্কও একটা ঠিক হয়েছিল। দু'চার মাস ঠিক তারিখেই সে-টাকা দিয়ে গেছে শ্যামলী। তারপরও দু'চার মাস। হাতের কঙ্কণ, কানের দুল কোথায় গেল তা না হলে! হ্যাঁ, শিউলি এ খবর যেদিন আঁচ করতে পেরেছে, সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে সে-পথ।

তবু ইন্দ্রনাথকে ফেলে রেখে যেতে চায় না শ্যামলী। কেন, কে জানে। হয়তো দিনের সুমধুর অংশটুকুর লোভেই।

সত্যি। দিনের বেলায় ওদের দেখলে মনে হয় না, জীবনে ওরা ছন্দ হারিয়েছে।

ইন্দ্রনাথকে কিছু একটা বলবে, মনে মনে ঠিক করে এসেছিল শিউলি।

উঠোনে একটা মোড়ার ওপর বসে দাড়ি কামাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ, আর অদূরে চা ছাঁকছিল শ্যামলী। কি একটা ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল

দুজনের মধ্যে। দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে শিউলি। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো ওর। কিন্তু। ও জানে, দুপুর শেষ হতে না হতে কিসের আতঙ্কে শ্যামলীর চোখে ভয় জেগে ওঠে; ও জানে, এ মিঠে মিতালির আয়ু সূর্যমুখী ফুলের মতই দিনাবন্ধ। শেষ রোদ্দুরের সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে যায় শ্যামলীর সুখের শিশির। না, ইন্দ্রনাথকে কিছু একটা বলতেই হবে। মনে মনে শক্ত হয়ে নিলো শিউলি। তারপর একটু শব্দ করে ঘরে ঢুকলো।

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি মোড়াটা ছেড়ে দিলে। সশ্রদ্ধ হাসি হেসে বললে, বসুন।

—বসতে আসিনি। একটু রুষ্ট ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলে শিউলি।

বিস্ময়ের চোখ তুললে ইন্দ্রনাথ।

—বলছিলাম, শিউলি আমতা আমতা করে বলে, এত রাত করে বাড়ী ফেরো কেন? সোজা আর সরল কথাটা বলতে বোধহয় বাধলো। বললে, আপিসের ছুটির পরে বাড়ী ফিরলেই তো পারো।

দিদির দিকে বিরক্তির চোখে একবার তাকিয়ে চায়ের পেয়ালাটা রেখে শ্যামলী পাশের ঘরে চলে গেল। ওর দুঃখ কম নয়, কষ্ট কম নয়। কিন্তু. অন্য কেউ বিশেষ করে শিউলি এসে সহানুভূতি দেখাবে বা ইন্দ্রনাথকে উপদেশ দিতে আসবে—এ যেন অসহ্য ঠেকে শ্যামলীর কাছে।

—মেয়েরাও মানুষ, ইন্দ্র। স্বামীর কাছে একটু মায়া অন্তত তারা আশা করে। তুমি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আমি আর কি বলবো।

শিউলির অনুরোধের স্বর যেন ওর বুক ছুঁয়ে গেল। চমকে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, শিউলির চোখের কোণে কি যেন!

আত্মধিক্কারের লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলো ইন্দ্রনাথ।

দিনের আলোয় শ্যামলী আর ইন্দ্রনাথ কত সুখী। হাসাহাসি, হৈ-হল্লা। ফুর্তিতে আর ফুরসতে যেন ডুবে আছে দুজনে। অথচ সূর্য নিভলেই নেশায় ডুবতে চায় কেন ইন্দ্রনাথ? সংসার ভুলতে চায় কেন? হ্যাঁ যৌবনে কে যেন স্পষ্ট একটা ছবি এঁকে রেখে গেছে ওর মনে। মনের পটে দুলে দুলে ওঠে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রবঞ্চনার মূর্তি। তাকে ভোলবার জন্যেই হয়তো!

শ্যামলী! হ্যাঁ, শ্যামলীকে ও অন্তরের অংগ করে নিয়েছে। নিতে চায়। ঠিক বিয়ের পর কয়েকটা মাস কত খুশিয়াল স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটিয়েছিল ওরা। শ্যামলীর অসুখের কয়েকটা দিন। আজও মাঝে

মাঝে মনে পড়ে যায় ইন্দ্রনাথের। একটি মুহূর্তের জন্যেও কাছ ছাড়া হতে পারতো না সে। আশা আর আশঙ্কা। স্থির চোখে চেয়ে দেখতো শ্যামলীর রোগপাণ্ডুর মুখ। মাথায় আইস-ব্যাগ ধরে না-নিদ্ রাত কাটিয়ে দিতো।

কত মিষ্টি হাসি, মধুর কথালাপ। ভরসা দিয়ে বাঁচিয়ে তুললো ও শ্যামলীকে। সে-সব দিন কোথায় হারিয়ে গেল। কে জানে।

না। অনেক ভাল মেয়ে শ্যামলী। নরম মনের মেয়ে।

কিন্তু।

সন্ধ্যা হতে না হতে কিসের ডাক শুনতে পায় যেন ইন্দ্রনাথ। নেশার! সব ভুলে যায় ও।

দোতলার জানালা থেকে দেখতে পায় শিউলি। আবছা অন্ধকারের রাস্তায় টলতে টলতে আসছে ইন্দ্রনাথ।

কপাট খুললো কপাট বন্ধ হ'ল। ভয়ে আশঙ্কায় বুক দুলে উঠলো শিউলির। চোখ ঠেলে কান্না এলো। ওর হাত কাঁপছে, পা টলছে। রাগে ব্যথায় দুঃখে। এবং। এবং তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো শিউলি। তারপর মাঝপথেই থমকে দাঁড়িয়ে রইলো।

সপ্ সপ্ করে দু'বার শব্দ হল। বেতের? শ্যামলীর নরম পিঠের ওপরই কি পড়লো নাকি? হ্যাঁ, আবার বাতাস চিরে ভেসে উঠলো শ্যামলীর কান্না। কান্না, কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, না কান্না চাপা দেবার চেষ্টা করছে?

—চুপ। ইন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলো।

আর সত্যিই চুপ করে গেল শ্যামলী।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের গলার স্বর শুনতে পেল শিউলি। —চুপ হারামজাদী। দিদির কাছে গিয়ে লাগাবি আর?

রাগে ফোঁস ফোঁস করছে ইন্দ্রনাথ, শিউলি শুনতে পেল।

শুনতে পেল ইন্দ্রনাথ বলছে আমি নেশা করি? আমি মারধোর করি?

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না শিউলি। ছুটে ওপরে উঠে এলো। এক ছুটে। এসেই বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

শ্যামলীর উপকার করতে গিয়ে একি করে বসেছে সে!

সকালে ওপরের বারান্দা থেকে শিউলি দেখতে পেল শ্যামলীর পিঠের ওপর আড়াআড়িভাবে দুটো কালশিটের দাগ। বেতের আঘাতে দুটো

বেগনী রেখা ফুটে উঠেছে। পিঠের কাপড় সরিয়ে কি যেন লাগাচ্ছিল শ্যামলী, শিউলি দেখতে পেল।

না। আর কোনদিন কিছু বলবে না সে ইন্দ্রনাথকে।

শেফালী আর শ্যামলী। দুবোন, বন্ধুও। আদরে আহ্লাদে ক্রোধে কান্নায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। কৈশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধন। যৌবনের চঞ্চলতা। হ্যাঁ, ওদের একজনের প্রথম যৌবনের উৎসুক আবেশ আর ব্যর্থ বিহ্বলতা আরেকজনের কাছে গোপন থাকেনি।

রেলিংয়ের থামটায় ঠেস দিয়ে ভাবছিল শিউলি। ভাবতে বসলেই কত কথা মনে পড়ে যায়!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস চোখ চেয়ে তাকালো শিউলি। দূরের আকাশের দিকে।

বিকেল ঝরে পড়ছে। পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, নিস্তব্ধ। আজ যেন আরো নিশ্চুপ, আরো জনহীন মনে হল। ছোট ছোট বাড়ীর সারি, পথের পাশে পাশে নাম-না-জানা গাছের ছায়া। শালিকের ডাক, চড়ুই পাখির হঠাৎ পাখা নাড়ার আওয়াজ। আর আকাশে মিইয়ে আসা রোদের ঝিকিমিকি। কেমন একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ হাওয়া দুলছে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন পৃথিবীর পাঁজরের তলায় চমকে চুপ করে গেছে।

চোখের মত মনটাও উদাস হয়ে যায় শিউলির। খেয়াল থাকে না, কখন নিজেরই অজান্তে ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। তিন বছরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ের দেহভারটুকুও টের পায় না।

ঠাণ্ডা মেয়ে খুশি। তবু কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকতে পারে। মা'র বুক নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করলে নিজের মনেই। তারপর কি যেন বললে। শিউলির কানে গেল না।

ও তখন ভাবছে ছোটবেলাকার কথা। শিউলির সেই অসুখের সময়। কতই বা বয়স তখন ওর। শিউলির হাতে ইন্‌জেকশনের ছুঁচটা ফোটাতে দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল শ্যামলী। যেন ওরই হাতে ফুটলো ছুঁচটা। সেদিন ওর ভয় দেখে হেসেছিল শিউলি! তারপর। অনেক দিন। রোগশয্যায় পড়ে পড়ে শিউলি বুঝি ভাত খাবার বায়না ধরতো! তাই শ্যামলী একদিন লুকিয়ে ওর জন্যে মাছ আর ভাত নিয়ে এসে দিয়েছিল।

বলেছিল দিদি, খেয়ে নে। মা ছাদে গিয়েছে, জানতে পারবে না।

মনে পড়লে হাসি পায় আজ।

শিউলির হাতে একটা ফোড়া হয়েছিল একবার। শ্যামলীরই বয়স তখন পনেরোর কাছাকাছি। ফোড়াটা কাটানোর সময় শ্যামলী কাছেই ছিল। হঠাৎ, শুধু রক্ত দেখেই কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল শ্যামলী?

অনেক, অনেক কথা মনে পড়ে শিউলির। দূরের দিগন্ত থেকে উদাস চোখ আর ফিরে আসতে চায় না। চোখে আর নাকে খুশির নরম হাল্কা হাতের স্পর্শে তন্ময়তা ভেঙে যায়। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুশির মুখটা গালের ওপর চেপে ধরে।

আদর পাবার মত, আদর করবার মত শ্যামলীর কোলেও যদি একটা কেউ থাকতো! শিউলির ভুলের জন্যেই হয়তো চটে আছে শ্যামলী। খুশিকে নিতে আসেনি আজ আর। কৌতুকের হাসি হেসে খুশিকে কোলে নিয়ে তরতর করে নীচে নেমে যায় শিউলি। তারপর শ্যামলীর পিঠের ওপব ওকে ঝুপ করে নামিয়ে ধরে বলে, মাসী মাসী করে সারা হ'ল ও, আর মাসীর সাড়াই নেই।

শ্যামলীও হেসে ওকে কোলে তুলে নেয়।

কিছু সময় খুশিকে নিয়েই কেটে যায় শ্যামলীর। আদব করে, শাসন করে।

কিন্তু. একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেই কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায় ওকে। চোখের তারায় ভেসে ওঠে কেমন এক ধোঁয়াটে দৃষ্টি।

তারপর। তারপর শিশুসন্ধ্যা ক্রমশ রাত হয়। রাত গভীর হয়। এপাশের ওপাশের বাড়ীর আলো নিভে যায়। আওয়াজের দমক মিইয়ে আসে। আবার সেই নির্জন. নিস্তব্ধ রাত্রি। ঈষৎ হাওয়ায় জানালার পর্দা ভাঙে, শুকনো পাতার শব্দ ভাসে। কালো কালো পীচের রাস্তা. কালো কালো গাছের গুঁড়ি। আর চাঁদের ছায়ায় ভেজা নির্জীব ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের তাঁবুগুলো পড়ে থাকে নিঃশব্দে। আকাশের কোণে হয়তো মেঘ জমে, চাঁদ আড়াল পড়ে। তারাজ্বলা দুধেলা বীথিটাও নিষ্প্রভ হয়। শুধু দু'একটা রেতো বাদুড়ের ডাক শোনা যায়। আর দূরের ক্বচিৎ ট্রামের ঘণ্টি।

জানালার গরাদ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শ্যামলী। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকে ওর দৃষ্টি। অন্ধের মত। কোন কিছুর দিকেই যেন চোখ যায় না ওর। আশা আর আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে ও।

সিল্যুটের ছবির মত একটা সুদৃঢ় চেহারা দেখা যায়। অসংযত

পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে আসছে ইন্দ্রনাথ। শ্যামলী দেখতে পায়। আর পরমুহূর্তেই ছুটে যায় দরজা খুলতে।

ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢোকে। কপাটে খিল লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় শ্যামলী। আর ইন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকিয়েই ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সেই অতিপরিচিত নৃশংস দৃষ্টি ইন্দ্রনাথের চোখে। অন্ধকারে যেন দুটো অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠলো ধক করে। রক্তলোলুপ বাঘের চোখের মত হিংস্র উত্তেজনা সে দৃষ্টিতে। শ্যামলীর চুলের মুঠির দিকে হাত বাড়ালে ইন্দ্রনাথ।

আর পরমুহূর্তেই বাতাস চিরে চিরে ভেঙে পড়লো একটা ভীতিবিহ্বল নারীকণ্ঠের চীৎকার।

চমকে চোখ তুললে শ্যামলী। বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালে দোতলার দিকে। ইন্দ্রনাথের চোখেও বিমূঢ় দৃষ্টি। অবোধ্য বিস্ময়ে এদিকে ওদিকে তাকালে ও।

শিউলির কণ্ঠস্বর। ওরা দুজনেই বুঝলো। দোতলার দিকে অনুবীক্ষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো। না, একটা ছায়াও দেখা গেল না।

শুধু সেদিনই নয়। প্রতিদিন।

ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে। বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় ও। শিউলির চীৎকার। কান্নাভরা চীৎকার। কিন্তু কেন? কেন, কে জানে!

মায়া হয়। বেদনা বোধ করে ইন্দ্রনাথ। শিউলির জন্যে। আর সুরঞ্জনের ওপর ক্রোধ।

হঠাৎ মোড় ফিরে গেল ইন্দ্রনাথের জীবনের। বিকেলে আপিসের ছুটির পরই ফিরে আসে ইন্দ্রনাথ। সারা সন্ধ্যাটা শ্যামলীর সঙ্গে গল্প করে। টুকিটাকি সাহায্য করে শ্যামলীকে, তার কাজে। কাজ বাড়ায় তার চেয়ে বেশি। শ্যামলীকে টেনে বসায় নিজের কাছে। কখনো বা ওর হাত থেকে এটা ওটা কেড়ে নিয়ে চটিয়ে তোলে। শ্যামলী তবু খুশি। হঠাৎ যেন ওর মনে হয়, ও নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে।

রাত ঘন না হতেই দুজনে শুয়ে পড়ে খাওয়াদাওয়া সেরে। কিন্তু ঘুম নামে না শ্যামলীর চোখে। ও অপেক্ষা করে। প্রতিদিনই অপেক্ষা করে থাকে ও। যতক্ষণ না শিউলির চীৎকারটা শুনতে পায়।

তারপর। একটা দীর্ঘশ্বাস।

অন্ধকারেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্তনবাস আর অন্তরাবরণ খুলে রাখে শ্যামলী। তারপর হাল্কা ভাবে একটা হাত রাখে ইন্দ্রনাথের পিঠের ওপর। তন্দ্রার ঘোর কাটে ইন্দ্রনাথের। আরো ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নেয় ও শ্যামলীকে। খুশিয়াল এক জোড়া সাপের মত আনন্দের আবেশে ডুবে যায় ওরা। শুধু কোথায় একটা মনের কোমল কোণে খোঁচা লাগে একটু। শিউলির চীৎকারটা বড় অসহায় করে তোলে শ্যামলীকে।

ঠিক্ ওদের সেই পুরোনো জীবনটাই যেন শিউলিকে ছুঁয়েছে। ঠিক্ ইন্দ্রনাথের মতই তো হাসিখুশি থাকে সুরঞ্জন। সারাটা দিন দেখে মনেই হবে না শিউলির জীবনে কোথাও কোনো খেদ আছে। কোন ছন্দপতন!

শ্যামলী মনে মনে ঠিক করলে, সুরঞ্জনকে ও বাধা দেবে। অত্যাচার নিজে সহ্য করে এসেছে ও এতদিন। তাই জানে, ব্যথাটা কোথায়। ও আজ বাধা দেবেই সুরঞ্জনকে।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল শ্যামলী, নিঃশব্দে। তারপর শিউলির ঘরের দিকে পা বাড়ালে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে চীৎকার করে উঠলো শিউলি।

ছুটে গিয়ে জানালায় উঁকি দিলো শ্যামলী। পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ও। দেখলে খিলখিল করে হাসছে শিউলি।

হঠাৎ কানে গেল শ্যামলীর—সুরঞ্জন বলছে, কি ছেলেমানুষি করো! শিউলি হেসে উত্তর দিলো, শ্যামলী তো সান্ত্বনা পায়।

[১৩৫৬]

দিয়ে আছে খানকয়েক মোটা মোটা বই। শোভন সংস্করণ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ। একখানি দোলানে চেয়ার। চেয়ারের দু'পাশে দুজন মহাপুরুষের ছবি। একটি কুমারী-পালঙ্ক। ফিরোজা রঙের রেশমী চাদর, উপাধানের রঙে রঙ মেলানো গাঢ় নীলের বর্ডার। দেয়ালে ফিকে নীল ডিসটেম্পর। দরজার ভারি পর্দা আর মেজবাতিটার শেডটাও নীলাভ। ঘরের এক কোণে ছোট্ট টুলের ওপর রাখা অজস্র শ্বেতপুষ্পের সুরভি উচ্ছ্বাস! শ্বেতপদ্মের পাপড়ির ফাঁকে ফাঁকে রজনীগন্ধার অন্ধ কলি। সব মিলে যেন মনে হয় মাঝ সমুদ্রের নীলিমার মাঝে ফুটে উঠেছে অগণিত ফেনিল ফুলের রাশ। তরল নীলার মাঝে তরঙ্গায়িত ফেনশীর্ষের শৈবত্য যেন। অনভ্যস্ত চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে আপনা থেকেই।

ইন্দ্রাণীও প্রথম দৃষ্টিতে সমাহিত বোধ করেছিল। নেশার গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে এবার তন্ন তন্ন করে চারপাশে তাকিয়ে দেখলে সে।

কৌতুকের চোখে সুজাতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে,—প্রেমে পড়েছিস ব'লে মনে হচ্ছে।

—পড়িনি, চেষ্টা করছি।

দু'জনেই মুচকি হাসলো।

গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরেব পৃথিবীতে দৃষ্টি চালিয়ে দিল ইন্দ্রাণী। অবসাদী চোখ উদাস হয়ে এলো তার।

তেতলার এ ঘরটা থেকে শহর কোলকাতার অনেকখানি দেখা যায়। ইন্দ্রাণী তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। জল নেমেছে রাস্তায়। দুরন্ত বেগে জলের ফুরফুরি ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন যানবাহন। একটা ডবল ডেকার বাস চলে গেল। ছুটতে ছুটতে পা-দানির ওপর লাফিয়ে পড়লো কে একজন। ঘাড় কাৎ করে পিচ ফেললে, তারপর বাঁহাতের চুন মাখানো পানের বোঁটাটা দাঁতে কেটে নিলো। বাসটা এগিয়ে চলেছে। ঘোরানো সিঁড়ির মাঝখান থেকে এক জোড়া যৌবন-চোখ চকিতে একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে মুখ ঘোরালো।

বাস। আরো অনেক গাড়ী। ট্যাক্সিগুলো ছুটছে হু হু করে। তুফানের মত। ক্লপ ক্লপ ধ্বনি তুলে ধীর মন্থর গতিতে চলেছে একটা ফিটন। ঝ'ড়ো কাকের মত এক সারি রিক্‌শা। রাস্তায় নেই শুধু ট্রাম। সামান্য একটু বৃষ্টি হ'লেই এ পথে আর ট্রাম দেখা যায় না।

বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ।

শুধু তেজোদ্দীপ্ত সূর্যের প্রখরতা ঢেকেছে এক ফালি নির্জলা মেঘ। পিচ ঢালা সড়কটা ছাড়া দুনিয়ার আর সব কিছুর ওপরই যেন পড়েছে এক অপূর্ব পরিচ্ছন্ন প্রলেপ। এক ঝাঁক বক বাতাসে সাদা ধবধবে বুক ভাসিয়ে উড়ে গেল।

—এত ছটফটে ছিলি তুই, আর এখন একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেছিস। অনুযোগের স্বরে ইন্দ্রাণী বললে।

হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা ক'রে সুজাতা উত্তর দিলে, বয়স বাড়ছে যে।

—বয়সে স্বভাব বদলায় না।

—তবে?

· সত্যি ক'রে বলতো, কাউকে ভালবাসতে—

কথা শেষ করতে দিলো না সুজাতা। খিল খিল করে বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠলো।

ইন্দ্রাণীর কানে হাসিটা কেমন যেন নতুন ঠেকলো। যেন চেষ্টাকৃত। ওর প্রথম যৌবনের সেই কৃত্রিম হাসির চেয়েও কৃত্রিমতর। কথাগুলোও যেন কাঠামোয় ঘেরা, রুল টানা খাতার আখরের মত। না। নেই পুরনো দিনের সেই সহজ স্বাচ্ছন্দ্য! হৃদ্যতায় ঘুণ ধরেছে। না। সুজাতা বদলে গেছে।

ইন্দ্রাণীর প্রশ্নের উত্তর দিল না সুজাতা।

বললে, প্রেমে পড়লেই তো মানুষ বেশী ছটফটে হয়।

একটা বিষাদী হাসি গজিয়ে উঠলো ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে। সজীব হতে পেল না হাসিটা, মাঝপথেই শুকিয়ে গেল। সুজাতার চোখের ওপর চোখ রাখতেও কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল ওর।

মুখ ফিরিয়ে বললে, পাখী যখন উড়তে শুরু করে তখনই পাখা ঝটপট করে, উঁচুতে উঠে আর পাখা নাড়ে না।

আবার হাসলে সুজাতা। ওর হাসির সঙ্গে তাল রেখে মুক্তোর মালা ছড়াটাও নেচে উঠলো।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ বলে উঠলো আগের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর হয়েছিস তুই।

—তুই পুরুষ হ'লে কথাটা শুনে সুখী হতুম।

—পরিচয় তো দিবি নে, ভদ্রলোককে জিগ্যেস করে দেখিস।

—স্মল পক্স হ'লেও কুৎসিত বলে না ওরা।

—সৌভাগ্য তোর।

চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তবুও অন্তরঙ্গ হ'তে পারছিল না ওরা। অথচ। বছর খানেক আগেও—

—হ্যাঁ রে অশোকার কোন খবর পেয়েছিস? ইন্দ্রাণী জিগ্যেস করলে।

দেরাজ খুলে একখানা চিঠি বের করে ইন্দ্রাণীর হাতে দিলে সুজাতা। চিঠিটা হাতে নিয়ে খুলতে ভুলে গেল সে। আর একজনের কথা মনে পড়েছে।

—মাস ছ'য়েক আগের চিঠি ওটা। সুজাতা বললে।

তন্ময়তা ভেঙে গেল ইন্দ্রাণীর।—কি করছে সে এখন?

—কোন একটা স্টেটে গভর্নেসের চাকরি নিয়ে গেছে, নাম দেয়নি স্টেটের, ঠিকানাও দেয়নি।

—গভর্নেস? তাই বলেই অবশ্য নিয়ে যায়। বিষণ্ণ ছায়া পড়লো ইন্দ্রাণীর মুখে।

চিঠিটা খুলে পড়লো সে এবার।

ছোট চিঠি। বিদায় সম্ভাষণ। বিরক্তিকর কিছু নেই, অনুশোচনা নেই, নেই কোন দরদী স্মৃতির স্মরণচিহ্ন।

অনেক কথা মনে পড়ে যায় ইন্দ্রাণীর।

সুজাতা, সে আর অশোকা। কত আন্তরিক বন্ধুত্ব। ভুলে গেছে, মুছে গেছে, উড়ে গেছে—স্মৃতির পটে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে সেদিনের ছবি। কলেজের করিডর, মেয়েদের বিশ্রামকক্ষ, ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চ। মেয়েরা ঈর্ষা করতো, হিংসা করতো। আর ছেলেদের সশব্দ হাসির বিদ্রূপ।

পুরুষ সতীর্থদের একজন ওদের নাম দিয়েছিল থ্রী মাসকেটিয়ার্স। তারই কথা মনে পড়ছিল ইন্দ্রাণীর। তার কথা মনে পড়লেই ইন্দ্রাণী আজও একটা চাপা বেদনা বোধ করে। মনশ্চক্ষে তার চেহারা, তার মুখখানা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলে ইন্দ্রাণী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেদিনের প্রত্যেকটি কথা রোমন্থন করতে ইচ্ছে হ'ল তার। বিগত দিনের একটি অসম্পূর্ণ স্বপ্ন মন্থন করে আনন্দ পায় না ইন্দ্রাণী, পরিবর্তে তার পাঁজরে পাঁজরে গুমরে মরে অসহ্য এক ব্যথিতবাষ্পের কুয়াশা। তবু। তবু সে ব্যথার আত্মনিপীড়ন থেকে কি এক অদ্ভুত উদগ্র খুশির আমেজ পায় ইন্দ্রাণী। আজও।

আশ্চর্য। শতচেষ্টা ক'রেও আজ তাকে মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারছে না ইন্দ্রাণী। তার সেই সুন্দর মুখখানা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে যেন।

কপালে একটা কাটা দাগ ছিল বোধ হয়।

অস্পষ্ট স্বরে ইন্দ্রাণী বললে, হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়ছে আজ।

—কার?

ব্যথার হাসি হাসলে ইন্দ্রাণী। বললে, চাবুক মারতে চেয়েছিলাম যাকে।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলে সুজাতা। খানিক চুপ করে থেকে বললে, সুকুমারকে তুই ভুলে যা ইন্দু।

হাল্কা হবার চেষ্টা ক'রে ইন্দ্রাণী বললে, ভুলেই তো গেছি, এত চেষ্টা করেও মুখখানা মনে পড়ছে না। কথার শেষে হাসলে ইন্দ্রাণী, তারপর ব্যগ্রতা চেপে প্রশ্ন করলে, তার কোন খবর টবর জানিস? কি করে? এখানেই আছে তো?

—সুকুমার? কি জানি, পরীক্ষার পর এই তো এক বছর কেটে গেল। দেখা হয়নি আর। কার কাছে যেন শুনলাম সেদিন, ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে।

হুঁ। অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলে ইন্দ্রাণী। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ভাগ্যিস সাবধান করে দিয়েছিলি ভাই, তা না হ'লে আজ কি যে হ'ত।

সুজাতা বললে, ওটুকুও যদি না করি তবে আর বন্ধুত্ব কিসের।

—কিন্তু কি চমৎকার চেহারা ভাই, তার ভেতর যে এত—

কথাটা চাপা দিয়ে সুজাতা বললে, তাই হয়।

ইন্দ্রাণী আর বাড়ালে না। ওরও যেন আজ আর ভাল লাগছে না অতীতের ইতিহাস। বাইরের পৃথিবীর দিকে নিশ্চল তাকিয়ে রইলো ও।

গ্যাসপোস্টের মাথায় একটা ভিজে কাক পাখা ঝাড়ছে। ভিড় জমেছে বাস স্টপের নীচে নীচে। সামনের বাড়ীর বারান্দায় এক সারি মেয়ের দল। পথের জনতা দেখছে তারা। হাসাহাসি আর কথালাপের দু'এক টুকরো ভেসে আসছে সেখান থেকে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুজাতার মুখের ওপর চোখ রেখে বিষণ্ণ ভাবে তাকালে ইন্দ্রাণী।

বললে, বাঁচিয়েছিস তুই সত্যি, তবু যেন মনে হয় মরেও সুখ ছিল।

একটু চঞ্চল হ'ল সুজাতা।—সুন্দর মুখ আর ভাল রেজাল্টের পেছনে কি ছিল সেটাও ভেবে দেখিস।

—জানি।

ছোট এক টুকরো উত্তর দিয়ে কথা পাল্টালে ইন্দ্রানী।

হঠাৎ বললে, উঃ, কতদিন পরে দেখা বলতো!

—হুঁ।

ইন্দ্রাণী হেসে প্রশ্ন করলে. বিয়ে করবি না?

—সুবিধে পেলেই করি। তুই?

—ইচ্ছে হয় না।

দু'জনে আবার চুপচাপ। টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে মনঃসংযোগ করলে সুজাতা। ইন্দ্রাণী চেয়ারের হাতলটায় নখের দাগ কাটতে লাগলো।

স্বপ্ন ভেঙে গেছে। বছর কয়েক আগের সুমধুর দিনগুলির কথা আবার মনে পড়ছে নতুন করে। কত বন্ধুবান্ধব, কে কোথায় ছিটকে গেছে। ওদের সেই কোডের ভাষায় কথা কওয়া, পুরুষ সতীর্থদের গোপন নাম, প্রফেসরদের দুর্বলতা। ডক্টর সেনের সঙ্গে মঞ্জুশ্রীর নাম জড়িয়ে রটনা করা। সুকুমারকে 'সবজান্তা' নাম দিয়েছিল মেয়েরা। আর সেই কালো লম্বা ছেলেটা বোঁ বোঁ করে সারা কলেজটা চক্কর দিতো অনবরত—'চরকি'। 'হঠাৎ-রাজা'—সিল্কের ধুতি পরে আসতো যে।

আরো অনেক কথা মনে পড়ে ইন্দ্রাণীর। কলেজ পালিয়ে পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়ানো। সে, সুজাতা আর অশোকা। দুপুরের রোদে চিনেবাদাম নয় তো চকোলেট চিবোতে চিবোতে চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম ঘুরে বেড়ানো। প্যাগোডা, পরেশনাথের মন্দির। কার্নিভালের রাতটা মনে পড়ে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল বাড়ী ফিরতে। বকুনি খেয়েছিল খুব একচোট। মিথ্যার প্রহসন বুনতে বুনতে বাসায় ফিরেছিল, কাজে লাগেনি। বিলম্বের কারণ বলার আগেই ভর্ৎসনার ঝর্ণা বয়ে গিয়েছিল। মনে পড়লে হাসি পায়। সুজাতা তো তারপর সাতদিন কলেজের পরেই বাসায় ফিরতো। ইন্দ্রাণীও দাদার কাছে কম কথা শোনে নি। কেবল অশোকাই ছিল স্বাধীন—সে যুগে।

আর একদিন। মেট্রোয় কি একটা সিনেমা দেখতে গেছে তারা ম্যাটিনিতে। পিছনের রো'য়ে বসেছিল কলেজেরই একদল ছেলে। পরিচিত নয়, কিন্তু মুখ চেনা। দু'পক্ষই হাসাহাসি করেছিল। ঠাট্টা বিদ্রুপ। সম্মুখ যুদ্ধ নয়। ইন্দ্রাণীরা শুনিয়ে শুনিয়ে ব্যঙ্গবাণ ছুঁড়েছিল পশ্চাদ্বর্তীদের উদ্দেশ্যে। তারাও। আড়চোখে পিছন ফিরে তাকানো, আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসা। ক্রমশ সেই সব দিনের গল্পে মশগুল হয়ে গেল সে আর সুজাতা।

—কি আশ্চর্য ভাই, এত ট্রেনে যাতায়াত করি তো একদিনও কলেজের কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল না। ইন্দ্রাণী বললে।

বিমর্ষ বোধ করলে সুজাতা। ইন্দ্রাণীর ব্যথার স্থানটি ওর চোখে পড়েছে। তবু চুপ করে রইলো। আগেকার মত আর সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে না।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো ইন্দ্রাণী। বললে, উঠি ভাই এবার, সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

—দাঁড়া চা জলখাবার আসুক।

—ওঃ! তাই তো বটে। তখন থেকে চা খাওয়াস নি তো, যা শীগগির ব্যবস্থা করে আয়। আবার বসে পড়লো সে।

—ব্যবস্থা হচ্ছে, বলে এসেছি।

—চল, মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। আর রুনি কোথায়, দেখলাম না তো তাকে? চিনতে পারবে আমাকে?

—সম্ভাবনা কম। তুইও হয়তো চিনতে পারবি না।

—কেন?

—এক বছরের মধ্যে এত বেড়েছে যে লোকে ভুল ক'রে আমার দিদি মনে করে।

—তাই নাকি? প্রাণ খুলে হাসলে ইন্দ্রাণী।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কনে-দেখা-আলো ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে। অদ্ভুত সুন্দর দেখায় পৃথিবীটা। রক্ত দিগন্তের লালিমায় সুন্দর দেখায় সারা দুনিয়া। লাল মেঘের রাঙা রোশনাই মেখে ইন্দ্রাণী আর সুজাতাও হয়ে ওঠে মোহনীয়।

সিন্দুর গোলা পশ্চিমাকাশের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুজাতা হঠাৎ বললে, পাড়াগাঁয়ে এই সময়ে মেয়ে দেখানোর বিধি ছিল আগেকার কালে।

—কেন?

—যে যতই কুৎসিত হোক এ সময়ে তাকে সুন্দর দেখাবেই।

ইন্দ্রাণী জবাব দিলো না। সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হ'ল সে। কিন্তু—ইন্দ্রাণী ভাবলে—তার নিজের চেহারাটাও কি এই মুহূর্তে সুজাতার মত সুন্দর হয়ে উঠেছে! কে জানে। ইচ্ছে হ'ল আয়নাটা নিয়ে এসে একবার দেখে সে নিজের মুখখানা। লজ্জায় পারলে না।

আশ্চর্য! আজ সুজাতার কাছেও তার লজ্জা। অথচ এই একটা বছর আগেও কত গোপন শলা-পরামর্শে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে সে। এই সুজাতারই মধ্যস্থতায় আলাপ হয়েছে সুকুমারের সঙ্গে। তার পর—

না। একটা বছরের অনুপস্থিতি যেন একটা যুগ।

—বিয়ে করে ফেল শীগগির। সুজাতা বললে মৃদু হেসে।—যৌবন তো শেষ হতে চললো।

—আর তুই ?

—দেরি নেই বেশী। যাকে খুশি বিয়ে করবার স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন বাবা মারা যাবার আগে। মাও বাধা দেবে না। খানিক চুপ করে থেকে সুজাতা আবার বললে, আর সত্যি বলতে ভাই, বিয়ে না করাটা এখন পাগলামি মনে হয়। কেন করবো না বিয়ে, তুই-ই বল না। একটা কিছু লক্ষ্য থাকতো তো অন্যকথা। আর ভাবাভাবি নয়, ভাবতে ভাবতেই তো অর্ধেক যৌবন পার হয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী হাসলো। সেই বিষণ্ণ হাসি।

বললে, যৌবনটা বয়সে নয়, মনে।

—কবিরা বলেন। ঠাট্টার সুরে সুজাতা বললে।

—তা হবে। কিন্তু, তুই তো জানিস, এক সময় বিয়ে করার জন্য আমিও পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

সুজাতা আবার অস্বস্তি বোধ করলে। কোন রকমে মুখে হাসি টেনে বললে, সে তো ব্যক্তিবিশেষকে বিয়ে করার জন্যে।

—বিয়ের শখ আমার ঐখানেই মিটে গেছে। বুঝেছি সব পুরুষই ঐ সুকুমারের মত।

সুজাতা প্রতিবাদ করতে পারলো না।

ইন্দ্রাণী শুকনো গলায় কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। চোখ ঠেলে জল এল ওর। জোর করে হেসে উঠলো ইন্দ্রাণী; তারপর জানালাটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখে আঁচল দিলে। মুখ মোছার কপট ভঙ্গিতে জল মুছলো। চেষ্টা করলো মুখে উৎফুল্ল হাসি টেনে আনার। প্রাণ খুলে হাসবার চেষ্টা করলো। কথায় কথায় নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে সে। না, সুজাতার কাছে গোপন ব্যথাটা প্রকাশ করা চলবে না। সুকুমারকে ভুলে গেছে ও, সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। গহন বেদনায় সান্ত্বনা পেতে চায় না সে সুজাতার কাছে। সুজাতা বদলে গেছে। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি

ওদের অতীত বন্ধুত্ব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আর নয়। সুকুমারের কথা আর তুলবে না ইন্দ্রাণী। সুজাতার চোখে ওর প্রেমের মূল্য আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

চুপচাপ বসে রইলো সে।

হিন্দুস্থানী চাকরটা চা জলখাবার দিয়ে গেল।

ওদের গল্প আর জমলো না। ইন্দ্রাণীর যেন মনে হ'ল সুজাতার কাছে ওর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। সুজাতা যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে ওর কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

চা খেয়ে উঠে পড়লো ইন্দ্রাণী। সুজাতার মা'র সংগে দেখা করে বেরিয়ে পড়লো। রুনি কোথায় বেরিয়ে গেছে, তার সংগে দেখা হ'ল না আর।

ইন্দ্রাণী অপেক্ষা করতে পারলো না। রাত নটার ট্রেনে চলে যাচ্ছে সে। দু'একটা জিনিস কিনতে হবে তাকে এখনও। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতে বললে সুজাতা, যদিও জানে ইন্দ্রাণী আর চিঠি লিখবে না। পরস্পরের সংগে ওদের জীবনে বোধ হয় এই শেষ সাক্ষাৎ।

তা হোক। সুজাতাও তাই চায়। ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো ও। ভাবলে, লোকে বলে পুরানো দিনের বন্ধুদের দেখা পেলে আনন্দ হয়, কিন্তু কৈ সুজাতার তো মোটেই ভালো লাগলো না ইন্দ্রাণীর সাহচর্য। ইন্দ্রাণীর চলে যাওয়াতে ও যেন খুশীই হ'ল।

আশ্চর্য মানুষের মন।

অন্ধকার হয়ে আসছে। আলোটা জ্বাললে সুজাতা। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। সড়কটা শুকিয়ে এসেছে এতক্ষণে।

নিজের মনে গুন্‌গুন্‌ করে কি একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বেশ পরিবর্তন শুরু করলে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বরফের চাকতির মত ঠাণ্ডা চাঁদ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আকাশের নীল চাঁদোয়ায় দু' একটা ক'রে বিচ্ছিন্ন তারার মালা। চাঁদের পাশে শোভা দিয়েছে, জ্যোতিচক্রের মত চাঁদের চারপাশে বৃত্ত বেঁধেছে আলোর কণিকা।

গ্যাস বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে বাঁশের মইটা কাঁধে করে চলে গেল লোকটা।

আ ত সী উ জ্জ্ব ল

শহর দক্ষিণের এ অংশটা যুদ্ধের সময় ছিলো মার্কিনদের মিলিটারি হাসপাতাল। তারপর সেই সাজসরঞ্জাম, বাড়িবাগান জুড়ে দেশী রুগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হ'ল। গড়ে উঠলো একটা নতুন ডাক্তারি কলেজ। আর হাসপাতাল।

দোতালা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়িখানা এলো সরমাদের জিম্মায়। এক একখানা ঘরে দু' দু'জন নার্স। সারা ম্যানশনটায় কম করে পঞ্চাশজন সেবিকার আবাস।

মানসী বয়সে ওর চেয়ে বেশি বড় না হলেও বেতনে এবং বিদ্যায় নিশ্চয়। গা-ছোঁয়া হাসপাতালটার মেট্রন ও। তাই আর-আর সিস্‌টারদের মনের কোণে ওর প্রতি যেটুকু ভালবাসা আছে তা ভেজালে মেশানো। সরমা কিন্তু সত্যি বেশ আপন হয়ে উঠেছে মানসীর। অন্তরঙ্গ। তাই দখিন-খোলা মাঝের সেরা ঘরখানাই হয়েছে মানসী আর সরমার কুমারীকুঠি।

ছোট্ট ঘর। দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে দু'খানা একক পালঙ্ক। একটা কম-দামী ড্রেসিং টেবিল। চিঠি লেখবার একখানা ক্ষুদে মেজ, সবুজ রং করা। আর খান দুই তেপায়া। সারা ঘরটায় ঐশ্বর্যের ছাপ নেই কোথাও। দারিদ্র্যের আছে হয়তো। তবু কত পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি। বাফ্ রঙের ডিসটেম্পর করা দেওয়ালের গায়ে কোন এক নাম-করা ওষুধ কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার।

সহজ কথায় সরমা আজ সুখী।

খাওয়া-পরার খরচ চালিয়েও বেশ কিছু টাকা হাতে থাকে ওর। কিন্তু সব টাকাই মা'কে পাঠাতে পারে না। ইচ্ছে হয় বৈকি। ছোট্ট বোন আর ছোট ভাই দুটি। তিনজনেই ইস্কুলে পড়ছে। মার অসুখ আর পুজো-পার্বণও যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। যে ক'টা টাকা পাঠায় ও, চারজনের পক্ষে তা কতটুকু! ইস্কুলের মাইনে, বই কেনার টাকা। ওষুধের দাম, মা কালীর মানত। আরো কিছু যদি পাঠাতে পারতো!

ব্যয়ের অঙ্ক ও অনেকখানি সংক্ষেপ করেছে, রুচির হানি ঘটিয়েও।

এ বোর্ডিঙের আর পাঁচজনের মত দু'জোড়া জুতো অবধি রাখেনি। রঙিন-শাড়ীর সঙ্গেও ঐ সাদা জুতোটাই চালিয়ে দেয়। প্রসাধনের পায়ে প্রণামী দেয় না, সিনেমা দেখে ক্বচিৎ কখনো।

ফুরসত পায় ছুটির দিনে। ফুর্তির ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে দেয় সেদিনটা। সারা সকালটা হৈ চৈ করে। এর ওর ঘরে ঢোকে, কারো বাক্সপ্যাঁটরা খোলে, কারো বা চিঠিতে চোখ আঁটে। এ দরজায় টোকা দেয়, ও দরজার ফাঁকে ছুঁড়ে দেয় দু'এক কলি ভাঙা গানের সুর, কাউকে টিটকারি দেয়, কাউকে সহানুভূতি।

সারা দুপুর এদিকে দল বেঁধে রাস্তায় টোঁ টোঁ। নিউ মার্কেটের ফলের দোকান, হোয়াইট্যাওয়েের শো-কেস। সিনেমার স্থিরছবির উইনডো, ওদিকে হ্কার্স-কর্নার। দশ-বারোজন মিলে এখানে-ওখানে জবরদস্তি দেখাবার চেষ্টা করে। বাসট্রামের সামনে হাত তুলে দাঁড়ায়, চাপা দাও নয়তো থামো। ব্লাউজের ছিটের দর কষাকষি করে, হিন্দিতে ধমক দেয়। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

আর-আর দিনগুলো একঘেয়ে। একঘেয়ে হ'লেও বিরক্তিকর নয়। সারা দিনের খাটুনিতে যা কিছু শ্রমাতুর ভাব তা সান্ধ্যরোমাঞ্চের বাতাস ওর কপাল থেকে মুছে নেয়।

বিকেলের মেঘের রক্ত যখন জমে কালো হয়ে যায়, হলুদ-রঙা বাতাসের তাপ কমে, তখন স্নানান্তের স্নিগ্ধসৌরভ মেখে সামনের বারান্দাটায় এসে বসে সরমা। এদিকে আকাশের প্রথম তারারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সাড়া না দিয়ে পারে না ও।

সারিবাঁধা কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে ওঠে। সন্ধ্যার সুগন্ধি বাসি-বাতাসকে টেনে নিয়ে যায়। আর নরম ঘাসের বীথিপথের ওপর হাল্কা পায়ে পায়চারি শুরু করে সরমা। এক একবার আচমকা মাথা তোলে, চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় অনেক অনেক অন্ধকারের দূরত্বে। আবছা আলোর ফিকে রোশনাই আর আরো দূরের জমাট অন্ধকার। এভেন্যুর দু'পাশে ল্যাম্পপোস্টের সারি। প্রহরী-আলোর আমেজটুকুও দূরে গিয়ে দিক হারিয়েছে। ফিকে হয়ে গেছে জনতার ভিড়। তবু। এগিয়ে যায় সরমা। তারপরই হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে একটি ছায়াপুরুষ। প্রতীক্ষাসফল আনন্দের হাসি উছলে ওঠে ওর চোখের নীলায়।

অমানিশার অন্ধকারই থাক বা শুক্লজ্যোৎস্নার জোয়ারই জাগুক আকাশে, নিরালা পৃথিবীর মাঝে, বন-কৃষ্ণচূড়ার আঁধারের চাঁদোয়ায় ঢাকা নিরালোক

পৃথিবীর মাঝে এসে নামে ওরা। পাশাপাশি। একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে এসে বসে ওরা দু'জনে।

রাত গভীর হয়ে আসে। আর মন। তারপর, একসময় যতি পড়ে ওদের মুগ্ধমনের কথালাপে। একক শূন্যতার মাঝে ফিরে আসে সরমা। কুমারী-পালঙ্কের নরম শয্যায় শরীর ছড়িয়ে রেখে চোখের পাতায় ঘুম নামাবার মন্ত্র পড়ে।

ওদিকের রোগা খাটে মানসী।

তন্দ্রাবেশে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সরমা। তবু ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বলতে হয়, ওর দৈনন্দিন রোমাঞ্চের ইতিহাস শোনাতে হয় মানসীকে। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে আসে সারা দুনিয়া। শব্দহীন। শুধু ওদের দু'জনের টুকরো টুকরো হাল্কা কথা। কাচের গেলাসে গুঁড়ো বরফের কুচির মত ঠাণ্ডা, ভাঙা ভাঙা।

মানসীর কাছে কিছু লুকোতে চায় না সরমা। লুকোতে পারে না। বুক উজাড় করে অদ্ভুত একটা আনন্দ পায় ও। ভরসাও।

কিন্তু—হ্যাঁ, মানসীর কাছ থেকেও একটা দিনের কাহিনী গোপন রেখেছে সরমা। শুধু একটি দিন।

বিকেল পাঁচটার ঘণ্টা পড়লো। আর অন্যান্য দিনের মতই সেদিনও কি এক অবোধ্য অস্বস্তি এসে ঢুকলো সরমার বুকে।

রোজই এমন হয়।

লম্বা ওয়ার্ড। দু'পাশে সারি-বাঁধা রোগশয্যা। মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ। সমস্ত ঘরখানায় একটা পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ। শান্ত আর নিঃশব্দ। প্রতিটি লোহার খাটে শ্বেতশুভ্রতার বিছানা বিছানো। আর রুগীদের শিয়রের কাছে টাঙানো এক একটি গ্রাফ-আঁকা চার্ট। হাসপাতালের সুদীর্ঘ ওয়ার্ড—এ দরজা থেকে ওদিকের ফটক অবধি যেতে পাঁচ মিনিট অন্তত লাগবে। অথচ সারাটা দিন সরমা অক্লান্ত।

কপালে ওর ঘাম ফোটে, মুখে হয়তো বা শ্রমোজ্জ্বল রক্তিমাভা। কিন্তু চোখে শ্রান্তির আবেশ দেখা দেয় না। রুগীরা কেউ সহজ, কেউ বা আড়চোখে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করে। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার বহুদিন পরেও হয়তো ওদের মনের পটে ভেসে ওঠে এখানকার দৃশ্যটুকু।

সরমা। নাতিশীর্ণ দেহ জড়িয়ে যার একখানি সাদা ফুটফুটে শাড়ী, পায়ে সাদা জুতো. মাথায় কালোকেশের কোমল প্রাচুর্য ঢেকে শুশ্রূষকের

শ্বেতচিহ্ন। সবে মিলে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে। জীবন্ত যৌবন। একটি ভ্রমরাকাঙ্ক্ষী রজনীগন্ধার অন্ধ কলির মত। উদ্দাম আর চঞ্চল। উন্মাদনা আর চপলতা। হ্যাঁ। খুটখুট করে ফ্ল্যাট-হিল্ জুতোর হাল্কা আওয়াজ চেপে চেপে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সারাটা দিন। তখনই থার্মোমিটার দিচ্ছে এর জিভের নিচে, জ্বরতরঙ্গের গ্রাফ আঁকছে চার্টের গায়ে। আর তখনই হয়তো ওর ঠোঁটের কাছে ধরেছে ওষুধের গ্লাস। দুটো হাল্কা হাসি এর দিকে, ওকে দুটো সান্ত্বনা, আরেকজনকে হয়তো বা তর্জনী-তোলা ধমক।

সত্যি। সারাটা দিন ও অক্লান্ত। কিন্তু পাঁচটার ঘণ্টা শুনতে পেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে ও। ছুটির ডাক শুনতে পায়, দিনান্তের রোদো বাতাস ওর ম'দো রক্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখা যায়। হাসপাতালের দক্ষিণের দেয়াল ছুঁয়ে গেছে চওড়া সড়ক। দু'পাশে একপথো পীচের রাস্তা, মাঝখানে ঘাসের জমিন। আর পথ বড় হ'লেও এদিকটায় গাড়ীঘোড়ার উৎপাত নেই। বেশ ঠাণ্ডা, চুপচাপ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসে না নাকে, হর্নের হুঠকারিতা নেই।

পাচটার ঘণ্টা পড়লো ওদিকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের পৃথিবী থেকে ছিটকে এলো খানিকটা চঞ্চল বাতাস। সান্ধ্যভ্রমণাদের ভিড় ভিড় গুঞ্জন কানে এলো সরমার।

আর একটি ঘণ্টা। তারপরই ছুটি।

হঠাৎ ঘরের আলো কাঁপলো। ভাঙলো নিঃশব্দতা। কারও কণ্ঠে উচ্চারিত স্বর, কারও চোখে বিষণ্ণ হাসি। টুকরো টুকরো কথার কাকলীতে ঘর কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ। প্রতিদিনই, ঠিক এই সময়টায় রুগীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এসে হাজির হয়। দৈনন্দিন সাক্ষাতের জন্যে।

আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরমার ওর চোখ যায় একশো বাষট্টি নম্বর বেডের দিকে। খাটের পাশের টুলটিতে এসে বসে সে। রোগশয্যায় শায়িত বন্ধুকে সাক্ষাতের সান্ত্বনা দিতেই আসে। কিন্তু, চোখ থাকে তার সরমার দিকে। প্রথম প্রথম কৌতুক বোধ করতো সরমা। নিজেরই অজান্তে ঠোঁটের কোণে ওর হাসি দুলে উঠতো তারপর সচেতন হতেই ঠোঁট টিপে হাসি চাপতো।

মন মদির হ'ত না সত্যি কিন্তু হাসিটা মধুর। তাই হয়তো অন্য

কোন অর্থ পেয়েছিল লোকটি, ভুল ভেবেছিল। ফলে সাহস বেড়ে গেল তার। যা ছিল মোমবাতির আলোর মত ঠাণ্ডা মোহময় দৃষ্টি, আশার আগুনে তা জ্বলে উঠলো।

অসহ্য লাগলো সরমার। অস্বস্তি বোধ করলো ও। মানসীর কাছে অনুযোগ করলো। উত্তর এলো বিদ্রূপের হাসি। শুশ্রূষকের জীবন বেছে নিলে এমন অনেক কিছুই নাকি সয়ে যেতে হয়।

সরমা প্রতিবাদ করলে, তা ব'লে অমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকবে কেন ?

মানসী হাসলে।—ও তো শুধু তাকিয়েই থাকে।

সরমা মনে-মনে চটে। বেশ। ও নিজেই এর ব্যবস্থা করবে।

সেদিন কিছু একটা বলবে বলেই লোকটির দিকে এগিয়ে গেল সরমা। ভর্ৎসনার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

—শুনুন।

না। সরমা নয়। ও কিছু বলবার আগেই লোকটিই ডেকে বসলো। সরমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে, কথা জুটলো না ওর মুখে।

দু'খানা দশ টাকার নোট ধরলে লোকটি ওর চোখের সামনে।—এ'র জন্যে কিছু ফলমূল আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন? এই টাকা কটা—

রুগীদের জন্যে ফলমূলের ব্যবস্থা নেই। টাকার বিনিময়ে সে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সাধারণত সেটা করে হাসপাতালের জমাদার বেয়ারার দল। দু'পাঁচ টাকা বখশিশের লোভে। তা বলে, সরমাকে? তবু হয়তো ক্ষমা করতো ও, কিন্তু লোকটির সুবোধ্য হাসি আর টাকার পরিমাণ—এ দুটো মিলিয়ে কি এক অর্থ পেল সরমা। রাগে রী রী করে উঠলো সারা শরীর।

মানসীকে বললে, এরপরও লোকটার আসা বন্ধ করবে না?

মানসী হাসলে।—এত সহজ ভাবিস?

—তবে ডিউটি বদলে দাও আমার। অন্য ওয়ার্ডে দাও।

উত্তর এলো, বোকা মেয়ে!

গোলাপী টার্কিশ টাওয়েলটা ওড়নার মত বুকে কাঁধে জড়িয়ে হাতে সাবানের কৌটোটা তুলে নিয়ে সান্ধ্যস্নানের জন্যে পা বাড়াচ্ছিল সরমা। পেছন থেকে ওর আঁচলটা টেনে ধরলো মানসী।

—এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিস কোথায় শুনি?

সরমা মৃদু হেসে বললে, বেশ যা হোক্। দিলে তো যাত্রাটা মাটি করে। গিয়ে দেখবো বাথরুমে পাম্পের জল নেই।

—খনার বচন পড়িস নি? আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে মায়।

—দিদি, মা নও। বয়সটা একটু বেশি হ'লে নয়—

—উঁহু, তা হ'লে কি আর তোর প্রেমের গল্প শুনতে পেতাম!

—দেখো মানুদি, গল্প-গল্প ব'লো না বলছি।

—ওঃ, চটেই লাল হয়ে আছেন মেয়ে। মান অভিমান দেখাতে হয় তার কাছে দেখিও। গম্ভীরভাবে বললে মানসী। পরক্ষণে হেসে ফেললে।—চুপ করে বসে আগে তোর উপাখ্যানটা বলে যা।

—বাঃ! কাল রাতে তো বললাম।

—উঁহু। দ্বিতীয় প্রেমিকটির কথা। ঐ হাসপাতালের ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক! কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে সরমা। —লোকটার কথা ভাবতেও আমার গা ঘিন-ঘিন করে।

—তবে, প্রথম প্রেমিকের কথাই বল্।

সরমা হাসলে, কি বলতে বাকী রেখেছি ?

সত্যি। কিছুই বাকী নেই। এর আগে কতবার যে বলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে, ঘুমন্ত তো নয়। জাগর প্রেম। দিনে দিনে ঘটে নতুন সংযোজনা। আরো কথা। আরো কামনা।

ব্যাপার হ'ল এই যে, সঞ্জীব আর সরমা দু'জনে মন-দেয়া-নেয়া করছে।

আত্মীয়স্বজন নয়, পাড়াপড়শীও নয় এরা কেউ। অতএব সে-খবরে মানসীর এত উৎসাহ কেন ? কেন কে জানে। তবে ঔৎসুক্য মানুদির চেয়ে কারও কম বলে তো মনে হয় না। আজ আর সঞ্জীব-সরমা উপাখ্যান কারও অজানা নয়। সরমার ডাক-নাম যে 'ঠাণ্ডা' তা যেমন জানতে বাকী নেই কারও।

একজনই দিয়েছে এ নাম, আর একজনেরই ডাকবার কথা এ নাম ধরে। কিন্তু মানুদির জ্বালায় কি কিছু গোপন রাখবার জো আছে। দু'মাসও হয়নি ও এ বোর্ডিংটায় এসেছে। অথচ ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা যে তিনজন এক জায়গায় হয়েছে কি দু'জনের কথা—সঞ্জীব আর সরমা।

দোষই বা কি! ছ'টার ছুটি হতে না হতে এসে ঢুকবে ও স্নানের ঘরে। তারপর মানসীর পাউডারের কৌটোটা টেনে নিয়ে পাফ্টা দু'গালে

ওদিকের কেদারাটায় উঠে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বই-কাগজগুলো উল্টে দেখতে শুরু করলো। অকারণে শব্দ করলে, কখনও পেয়ালা-পিরিচের, কখনও বা হাত থেকে বই ফেলে। চাবির থোকাটা ঝনঝন করলো, দরজার খিলটা একবার লাগালো, একবার খুললো। শুকনো কাশি কাশলো। শেষে চীৎকার করে ঝি দুখীর-মাকে ডাক দিলো।

একটু পরেই সঞ্জীব উঠে এলো বাইরের ঘর থেকে।

—একজন বন্ধু এসেছে। বাইরে গিয়েছিল, ক'মাস পরে ফিরেছে। বিয়ের সময় তো আসতে পারেনি, তাই আজ এখানে ফিরেই এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আজ বোধহয় আর সিনেমায় যাওয়া হ'ল না।

সরমা অনুযোগ করলে।—সারাদিন খেটেখুটে এসেও তোমার দেখা পাওয়া যায় না। বন্ধু। অন্য সময়ে যেন আসতে পারে না।

—আহা, ওর কি দোষ বলো। সঞ্জীব বোঝাতে চাইলো।

সরমা উত্তর দিলে, আজই তো প্রথম নয়। রোজই তো তোমার একটা না একটা লেগেই আছে।

সঞ্জীব হাসলে।—কি করবো বলো! বন্ধুবান্ধবরা তা নইলে যে বৌপাগলা বলবে। এমনিতেই তো বলে আমাকে নাকি তুমি আঁচলে বেঁধে রেখেছ।

সরমাও হেসে ফেললে। বললে, বলুকগে। সকালে তো দু'মিনিট কথা বলবার সময় পাই না। দুপুরে তুমিও বেরিয়ে যাও, আমিও বাইরে থাকি। একা-একা চুপচাপ বসে থেকে আমি বাপু হাঁপিয়ে উঠি।

—কেন, বৌদির সঙ্গে তো গল্প করে কাটাতে পার।

সরমা চটে গেল।—বেশ, তাই যাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলাটাও যদি তোমার বন্ধুদের না হ'লে—

—চটছো কেন?

—আমি তার চেয়ে আবার বোর্ডিংয়ে ফিরে যাব। সেখানে তবু পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটে।

সঞ্জীব হেসে হাতটা চেপে ধরলো সরমার। বললে, এখন চলো তো, হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

প্রথমটা আপত্তি করে সরমা। মুখে বলে, চিড়িয়াখানার জীবজন্তু তো নই যে রোজ রোজ একজন করে দেখতে আসবে।

মনে মনে আর কি লজ্জা পায়। তা ছাড়া ভালও লাগে না।

শেষকালে রাজি হয় ও। সঞ্জীবের পিছনে পিছনে নীচের বসবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। কি একটা পত্রিকার পাতায় চোখ ছিল হিমাংশুর। শব্দ শুনে মাথা তুললে। নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত। মুখে মৃদু হাসি। পরক্ষণেই হিমাংশুর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। হাত আর উঠলো না।

সরমাও চমকে উঠেছিল। সঞ্জীব লক্ষ্য করলো না, নয় তো সরমার সাদা চাদরের মত রক্তহীন মুখটা দেখতে পেত।

আলাপ করিয়ে দিলো সঞ্জীব। কিন্তু ওরা দু'জনেই বড় অস্বস্তি বোধ করলো। রেহাই পেলেই যেন বাঁচে। তারপর একসময় হিমাংশু চলে গেল বিদায় নিয়ে।

সরমা ভাবলে, ও বোধহয় আর কোনদিন আসবে না।

ভুল!

দিনকয়েক পরেই আবার এলো হিমাংশু। আসতে শুরু করলো।

প্রথম প্রথম সরমার চোখে জাগতো একটা ভয়ার্ত ভাব। শঙ্কার শিহরণ। ক্রমশ ঘৃণা আর বিরক্তি বোধ করলে সরমা। কারণে অকারণে জেদ ধরে কেন সঞ্জীবের কাছে, সরমাকে ডেকে আনায় কেন। কখনো বলে, চলুন বেড়িয়ে আসি; কখনো সিনেমায়। টুকিটাকি দু'চারটে জিনিস কিনতে যাবে হয়তো সরমা আর সঞ্জীব, হিমাংশু এসে জোটে—চলুন আমিও যাই। আর ক্ষণে ক্ষণে চোরা চোখে তাকাবে সরমার দিকে সেই কুৎসিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

সেদিন সঞ্জীব ফেরেনি তখনও। হিমাংশু এসে হাজির হ'ল।

সরমা ওর দিকে না তাকিয়েই বললে, উনি আসেন নি এখনও।

—তা হ'লে একটু অপেক্ষা করি, কি বলো? হিমাংশু হাসলো। একটু থেমে বললে, আপত্তি নেই তো তোমার? শেষের শব্দটার ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েই বললে।

চমকে ফিরে তাকালো সরমা। ক্রোধে ফেটে পড়লো যেন। বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় গলায় বললে, হ্যাঁ, আপত্তি আছে আমার। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে। নির্লজ্জের মত কোনদিন আর আসবেন না এখানে।

অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল হিমাংশু, প্রথমটা। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো।

বললে, ভুল করছো সরমা। বেরিয়ে যদি যাই—

লতিফ সাহেব বলে, রাখো তোমার ইজ্জতের কথাটা। মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে যে, লাজশরম হবে চাঁদির।

কথাটা সত্যি।

মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে। পঁচিশ ঘর মুসলমানের ছোট্ট গাঁ। জাতেই মুসলমান, আদব-কায়দায় নয়। গরীবের গাঁ, কেউ ডিঙিতে মাছ ধরে বেড়ায়, কেউ তাঁত বোনে। আর বেশির ভাগই লতিফ সাহেবের জমি চষে, ধান ভানে, আর নয়তো খেজুর রসে জ্বাল দিয়ে গুড় বানায়।

একটিই লোক আছে—বাচ্চা করিম। বাপ মারা গেছে, এখন পাটোয়ারী কারবারটা করিম নিজেই দেখে। আশ-পাশের গাঁ থেকে ঘি, ডিম আর গুড় কিনে চালান দেয় সদরের হাটে। পয়সা হয়েছে, তার প্রমাণ দু' দুটো বিবি করিমের। নামটা কিন্তু সেই বাচ্চা করিমই রয়ে গেছে।

করিমের চেহারাটা কিন্তু বেশ ছিমছাম। পাকা দালান তুলবে ব'লে ইটের পাঁজা পোড়াচ্ছে সদর থেকে রাজমিস্ত্রী এনে। দু' দুটো বিবি, দু' জনেরই গলায় রুপোর হাঁসুলি, মিনে-করা বাজুবন্দ। নক্সাকাটা ফুলবাহার শাড়ী বানায় তাঁতী-ঘরে বায়না দিয়ে। এ ঘরে চাঁদির বিয়ে দিলে মেয়েটা সুখী হবে, ভাবে ছোট বিবি। আর তাই চাঁদবানু যখন-তখন খিড়কি পার হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে গেলে রেগে যায় সে।

চাঁদবানু কিন্তু অত-শত বোঝে না, হাতে লণ্ঠন নিয়ে গোয়াল দেখে, খড়ের জাবনায় হাত ডুবিয়ে দেখে জল আছে কি না, তার পর গুণে গুণে মুর্গীগুলোকে ঝাঁপিতে ভরে।

একটা কম হ'লে চীৎকার করে ডাক দেয়।—অ কাসেম, মুর্গীগুলো গুণতি করে দেখো ফের, একটা খাটাশে ধরলো না তো!

আঠারো বছরের জোয়ান কাসেম তাতেই খুশি, চাঁদবানুর কাছ থেকে কাজ পেলে আর কিছু চায় না ও। মিঠা সায়রের পাড় খুঁজে খুঁজে মুর্গীটা ধরে আনে, মুখ-চোখের ভাব যেন কত বড়ো একটা কাজ করেছে।

কিন্তু হাসে না কেন চাঁদবানু? কেন জিগ্যেস করে না, কোথায় পেলো কাসেম দলছুট মুর্গীটাকে, কাদায় কাদায় কত ঘুরতে হয়েছে তাকে, সামনে দিয়ে সরাৎ করে গোখরো গেছে কি না ফণা দুলিয়ে!

হোক্ কাজের কথা, কথা শুনতে পেলেই কাসেম খুশী। কথা বলতে পেলে হয়তো আরো খুশী হ'ত। কিন্তু তেমন সুযোগ বড়ো একটা হয় না। সারাটা দিন ক্ষেতে লাঙল টেনে সন্ধ্যের সময় ফিরে আসে।

—এক ছিলিম তামুক দেবেন গোমস্তা সাহেব!

গোমস্তা সাহেব এ সময়টা এক গেলাস চায়ের লোভে পাটোয়ার বাচ্চা করিমের বাড়ীতে আড্ডা জমায় জেনেও, গোমস্তা সাহেবের নাম ধরেই ডাক দেয় কাসেম। বার দুই ডাক দিলেই বেরিয়ে আসে চাঁদবানু।

বলে, অ কাসেম, এই নাও তোমার তামাক।

আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারে হাতড়ে আঙিনাটার সামনে যায় কাসেম। দু'হাতের আঁজলা এগিয়ে দেয়। আর উঁচু আঙিনার ওপর থেকেই ওর হাতের ওপর তামাকটা ফেলে দেয় চাঁদবানু।

—একটু আঙার দিবে না?

চটে যায় চাঁদবানু।—কাজ-কামের চেয়ে তোমার ফরমাশটাই বেশি বেশি কাসেম! বলে দপ-দপ করে পা ফেলে চলে যায় উনোন থেকে আগুন আনতে।

ও তো বোঝে না আসলে কাসেমের ফরমাশটা কেন। মোট কথা চাঁদবানুর দিকে তাকিয়ে থাকতে, চাঁদবানুর হাঁটাচলা—সব—সব কিছুই যেন ভালো লাগে। আর ঘরে ফিরে ঘুম আসে না ওর চোখে। শুধু চাঁদবানু চাঁদবানু। স্বপ্ন দেখে অনেক টাকা জমিয়েছে কাসেম। জমিজমা না থাক্, খেজুরের গাছ আছে বারোটা, খেজুরের গুড় আর পাটালি বানিয়ে সদরে বেচে এসেছে চড়া দরে। তারপর সেই টাকা নিয়ে শুরু করেছে করিম সাহেবের মত পাটোয়ারী কারবার। করোগেটের ঘর হয়েছে, বিলিতী মাটি অর্থাৎ সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে ঘরের মেঝে।

তারপর?

তারপর লতিফ সাহেব যেন এসে বলছে, অ কাসেম, সবই তো হলো, জমিজমাও কিনলে, এবার বিয়াসাদি না করলে ঘর যে আঁধার সেই আঁধারই রয়ে যাবে।

কাসেম তখন বলবে, বিবি আনবার মত মেয়ে কই লতিফ সাহেব, আপনিই কন্ দেখি?

—কেন, আমার চাঁদিকে তো ছোটকাল থেকে দেখছো তুমি।

সত্যি! তা যদি কোন দিন সম্ভব হয়। ভাঙা চালের খড়ের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে কাসেম। মুখটা তো দেখতে পায় না অন্ধকারে, আর আলো থাকলেও তো নিজের মুখ নিজে দেখতে পাবে না, তবু কাসেম বুঝতে পারে, তার মুখে যেন হাসি লেগে রয়েছে।

নিজের মনেই কখনো হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ময়লা গামছাটার খুঁটে চোখ মোছে। জন খাটার নসীব যার, সে কি না স্বপ্ন দেখে চাঁদবানুকে

বিয়ে করার! বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে কাসেমের।

চাঁদবানু কিন্তু অত-শত বোঝে না। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন কাসেমের ওপর দয়া হয় ওর। যেদিন বেগার দিতে আসে কাসেম, চাঁদবানু ডেকে কথা বলে।

কাজের শেষে কাসেমের হাতে তেল ঢেলে দেয়, বলে, ডুব দিয়ে এসো মিঠা সায়রে, তোমার ভাত হয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে এসে মরাইয়ের পাশে এনামেলের থালা-ঘটি নিয়ে বসে পড়ে কাসেম। চাঁদবানু গরম ভাত ঢেলে দেয় থালায়, আর ডাল। তরি-তরকারিও থাকে কোন কোন দিন।

বসে বসে পেট ভরে খায় কাসেম, আর সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করে চাঁদবানু। বলে, অ কাসেম, বুড়া হতে চললে, বিয়াসাদি করবে না?

—বিয়াসাদি? হাসে কাসেম। বলে, আমাদের কে বিয়া করবে, নিজের পেটটাই কথা শোনে না।

বলে বটে, কিন্তু সন্দেহ যায় না। বিয়ের কথা কেন বলে চাঁদবানু? তবে কি কাসেমের স্বপ্নটা ওর মনেও উঁকি দেয়!

মনের ভেতর গুন্‌গুনুনি শুরু হয়। নিজের মনেই একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে করিম সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়।

হিসেবের খাতা দেখতে দেখতে চোখ তুলে তাকায় করিম সাহেব।—কি কাসেম, খবর আছে নাকি কিছু?

—একটা কিছু বাণিজ্য বাৎলে দেন সাহেব। জন-মজুর খেটে তো পেট চলে না।

হো-হো করে হেসে ওঠে করিম সাহেব।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, বাণিজ্য আছে একটা, করবে তুমি?

ঘাড় নাড়ে কাসেম।

করিম সাহেব মৃদু হেসে বলে, বিশটা টাকা পাবে নগদ, বিয়া করতে হবে।

—বিয়া? চোখ কপালে তোলে কাসেম।

করিম সাহেব হেসে বলে, এ বাণিজ্যটা খুব ভালো কাসেম। সদরের মহাজন বাবুমিঞা তার এক বিবিকে তালাক দিয়ে নিজের হাতে নিজেই কামড় দিচ্ছে এখন।

কাসেম তবু বুঝতে পারে না, তেমনি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

করিম সাহেব ধীরে ধীরে বলে, আমাদের মুসলমানের ধর্মটা বড়ো

কড়া কাসেম! হিন্দুর ঘরের বৌকে বাপের বাড়ী তাড়িয়ে আবার ফিরে লওয়া যায়। আমাদের একবার তালাক দিলে সে বিবিকে ঘরে আনা যায় না।

কাসেম তবু কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

করিম সাহেব আবার বলে, হাঁ, সে বিবিকে অন্য কেউ বিয়া করে তালাক দিলে তবেই তালাক দেওয়া বিবিকে আবার বিয়া করা যায়, ফিরে আনা যায়, এটা আমাদের কানুন।

কাসেম বলে, হাঁ সাহেব, মুসলমান ঘরের কানুন মানতে হয়।

—তাই তো বলছি কাসেম। বাবু মিঞার বিবিটাকে তুমি বিয়া করে তালাক দাও, কুড়িটা টাকা পাবে আর ঘরের বিবি তার ঘরে ফিরবে।

লাফিয়ে ওঠে কাসেম।—ছি ছি, এ কি কন সাহেব! গরীব মানুষের কি ইজ্জত নাই?

—ইজ্জত! হো-হো করে হেসে ওঠে করিম সাহেব। বলে, কুড়িটা টাকা পাবে, ভেবে দেখো কাসেম।

ভেবে দেখেছে কাসেম, অনেক ভেবেছে। গরীব হ'লেও অমন ভাবে ইজ্জত নষ্ট করতে পারবে না সে। তার চেয়ে মাছ ধরার নাম করে নদীতে ডিঙি ভাসিয়ে চলে যাবে একদিন, ফিরবে না আর। তবু তো চাঁদবানু বলবে না, কাসেম তালাক বিক্রী করে।

কাজ করতে করতে কেবলই ভয় হয় কাসেমের। চাঁদবানুর কানেও পেঁাছে যাবে না তো কথাটা! করিম সাহেব মিছে করে বলবে না তো, কাসেম রাজি হয়েছে!

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছিল কাসেম।

চাঁদবানু বলেছে, অ কাসেম, সদরে হাট বসেছে, আমার জন্যে চার গাছা রঙিন জলচুড়ি এনে দেবে?

কাসেম হেসে বলেছে, চুড়ি? তুমার জন্যে চাঁদ আনতে পারি, কও তো আনি। বলে কোমরে পয়সা গুঁজে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল কাসেম।

কিন্তু হঠাৎ কিসে যেন, বোধ হয় জলসাপে কাটলো কাসেমকে। তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে এলো সে, ডান হাতটার অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে।

চীৎকার শুনে কেউ কেউ ছুটে এলো। লতিফ সাহেব হেকিম আনালো মনিরপুর থেকে। কিন্তু যন্ত্রণা কমলো না।

হেকিম বললে, সদরের হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিসে কামড় দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

মাস কয়েক পরে সদরের হাসপাতাল থেকে যখন ফিরে এলো কাসেম, গাঁয়ের লোক দেখে চমকে উঠলো। কনুইয়ের ওপর থেকে ডান হাতটা একেবারে কাটা।

হাসিটা কান্নার মত দেখালো কাসেমের। বললে, ডাক্তাররা বললেন হাতটায় পচন ধরেছে কেটে বাদ দিতে হবে। তা বাদ দিয়ে দিলেন তাঁরা।

কিন্তু কাসেম তখনও বুঝি জানতো না, সত্যিই একখানা হাত কাটা গেছে তার। তার যে রঙিন মন হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরতে চাইতো সেই হাতটাই কাটা গেছে।

লতিফ সাহেব বললে, একটা লোকের ভাত তো আর খরচ হবে না কাসেম, তুমি আমার বাড়ীতেই থাকবে। চাঁদি তো নেই কাসেম, আমার ঘরটা আঁধার করে চলে গেছে চাঁদি বাচ্চা করিমের ঘর আলো করছে।

চলে গেছে চাঁদবানু? করিম সাহেবের ঘর আলো করতে চলে গেছে? ঝর-ঝর করে দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো কাসেমের। বাঁ হাতটা মাথায় রেখে বসে পড়লো সে।

লতিফ সাহেব উদ্বিগ্ন হযে জিগ্যেস করলে কি হ'ল কাসেম?

—হয় নাই কিছু, বড়ো কাহিল লাগছে শরীরটা। উত্তর দিলো কাসেম।

পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে হন্-হন্ করে করিম সাহেবের বাড়ীর দিকে চলে গেল। কাটাখালের কাছে পৌঁছে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলো কাসেম।

রাতারাতি যেন ভোল পাল্টে গেছে বাড়ীটার। ক'টা মাস হাসপাতালে পড়েছিল কাসেম, আর তারই মধ্যে এত সব ঘটে গেল? চাঁদবানুর বিয়ে হয়ে গেল করিম সাহেবের সঙ্গে? তা হোক্, করিম সাহেব না হোক্ কোন উঁচু ঘরে যে বিয়ে হবে চাঁদবানুর তা সে জানতো। কিন্তু এমন উঁচু ঘরে?

দূর থেকে তাকিয়ে রইলো কাসেম। দেখলে, ইটের দেয়াল উঠছে, পাকা দালান হয়েছে করিম সাহেবের। দোতলায় একটা টিলে কোঠাও যেন হবে বলে মনে হ'ল। সামনের সারকুঁড়ের পাশের জমিটুকুন ভরে আছে পালং শাকে। আর সারের গাদায় চরে বেড়াচ্ছে অগুন্তি মুর্গী। গোয়ালে চার চারটে গাই।

সত্যি, এমন বাড়ীতে যখন বিয়ে হয়েছে চাঁদবানুর, তখন সুখী হবে সে নিশ্চয়ই। তাই যেন হয়, মনে মনে কাসেম বললে, তাই যেন হয়। চাঁদবানুর জন্যে পীরের দরগায় মানত করে আসবে কাসেম।

কিন্তু চাঁদবানুকে একটুক্ষণের জন্যে দেখে আসতে ইচ্ছে হয় তার। ইচ্ছে হয় আগের মতই গিয়ে তামাক চাইতে, দুটো কড়া কথা শুনে একমুখ হাসতে। অথচ তা বুঝি আর সম্ভব নয়। যে মেয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া ছুটে বেড়াতো, জলকাদার নালাটা পার হবার সময় যার পায়ের গোছা চোখে পড়েছে কাসেমের কত বার, সে বোধ হয় এখন আর দেখাও দেবে না।

তবু করিম সাহেবের বারান্দায় গিয়ে হাজির হ'ল কাসেম। লতিফ সাহেবের গোমস্তা আর আরও জনকয়েক লোক বসে বসে মোসায়েবি করছে তখন।

কাসেমকে দেখে সবাই চমকে চোখ তুললে কপালে।—কাসেম ভাই যে হাতখানা কি হ'ল ভাই কাসেম? কে যেন প্রশ্ন করলে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে কাসেম।—ডাক্তার কইলেন, হাতটার পচন ধরছে, তাই...

করিম সাহেবও দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বললে, শোনো কাসেম শোনো।

কাছে এগিয়ে গেল কাসেম।

করিম সাহেব বললে, আমি তো মাসের বিশটা দিনই সদরে থাকি, তা দালান তুললাম, ঘরটা দেখাশুনার তো লোক লাগবে। তুমি আমার কাছেই থাকো কাসেম!

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। সেইজন্যেই তো এসেছিলো করিম সাহেবের কাছে। মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করলো চাঁদবানু—চাঁদবানুর দেখা পায় না একবার? তা হ'লে দেখতে পেতো চাঁদবানুর চোখে জল টল-মল করে কি না তার কাটা হাতখানা দেখে।

অনেকক্ষণ বসে রইলো কাসেম, তারপর তামাকের ছিলিমটা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালো।—যাই করিম সাহেব, গাঁ ঘরগুলো দেখে আসি একবার।

আনমনে করিম সাহেবের বাড়ীর পর্দাঢাকা জানালাটার দিকে একবার চোরা-চোখে তাকিয়েই মাঠের পথ ধরছিলো কাসেম।

হঠাৎ মেয়েলী গলার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো।

—অ কাসেম!

চাঁদবানুর গলা না? ফিরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো সে। দেখলে, খিড়কির দরজার পাশে বোরখায় মুখ ঢেকে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে যেতেই মুখের পর্দাটা সরিয়ে ফেললো চাঁদবানু। তার পর কাসেমের কাটা হাতটার দিকে তাকিয়েই সশব্দে খিল-খিল করে হেসে উঠলো।

—অ কাসেম, হাতটা তোমার কোন বিবিকে দিয়ে এলে?

কাসেম চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ফিস-ফিস করে বললে, যে হাতে তোমার ফরমাশ খাটছি সে-হাতে অন্য কারও ফরমাশ খাটবো না তাই .

খিল-খিল করে আবার হাসলো চাঁদবানু। তারপর বললে, এই বেলা এখানেই ভাত খাবে, গোসল করে এসো।

সারাটা গাঁ ঘুরে ঘুরে তারপর ফিরে এলো কাসেম। একটা কলারপাতা তুলে এনে ধানগোলার পাশে আগের মতই বসলো।

চাঁদবানু জল ঢেলে দিল ঘটিতে। গরম ভাত পড়লো পাতার ওপর। কি সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এলো পাতার গরম ভাত পড়তেই। ভাতের ওপরেই ডাল ঢেলে দিলো চাঁদবানু। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে। আহা, বেচারী—বাঁ হাতে খেতে কষ্ট হচ্ছে কাসেমের। ডাল গড়িয়ে পড়ছে পাতা থেকে। ভাতের আড়া দিতে পারছে না।

চোখ ছল্ছল্ করে উঠলো চাঁদবানুর।

ছুটে পালালো সে সেখান থেকে। এ দৃশ্য বুঝি দেখা যায় না।

কাসেম কিন্তু মাথা হেঁট করে খাচ্ছে তো খাচ্ছে। বুঝতে পারলো না চাঁদবানু কেন চলে গেল।

খাওয়া শেষ করেও যখন চাঁদবানুর দেখা মিললো না, তখন ঘটির জলটা ঢকঢক করে শেষ করে পাতাটা মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

করিম সাহেবের কাছেই তো কাজ পেয়েছে কাসেম, আজ না আসুক চাঁদবানু, আবার তো দেখা পাবে।

দেখা সত্যিই হোত, কথাও। চাঁদবানু কাছে এলেই যেন কথা আর শেষ হতে চাইতো না কাসেমের। আর চাঁদবানুও যেন ঐ সময়টুকুর জন্যেই হাসতে, কথা বলতে উন্মুখ হয়ে উঠতো। দু'জনেই বুঝতে পারতো না, ওদের হাবভাব দেখে করিম সাহেবের অন্য বিবিদের মধ্যে কি ফিসফিসানি চলে।

যেদিন সদরে চলে যেত করিম সাহেব, সেদিন বাড়ী পাহারা দেবার

জন্যে বাইরের বারান্দাটায় শুতো কাসেম। আর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতো চাঁদবানু। বাপ-মায়ের খোঁজ-খবর নিতো। যত দুঃখের কথা বলতো কাসেমের কাছে। অন্য বিবিরা কত দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে, কি গালাগালি দেয় বড়ো বিবির মেয়ে. একদিনের তরেও বাপের কাছে কেন যেতে দেয় না করিম সাহেব।

তাদের কথা আর কেউ শুনছে কি না, আর কেউ দেখছে কি না তাদের, সে হুঁশ থাকতো না কারও। আর থাকবেই বা কেন? চাঁদবানুর বাপের কাছে জন খাটতো কাসেম। তা কাসেমের কাছে সুখদুঃখের কথা বলবে না তো. মন হাল্কা করবে কার কাছে সে?

করিম সাহেব কিন্তু অত-শত বুঝলো না। সদর থেকে ফিরে এসে তার দু' বিবির কাছেই শুনলো একই কথা। চাঁদবানু নাকি কাসেমের কাছে আসতো রাত হ'লেই। বিবিরা নাকি নিজের চোখে দেখেছে সব।

রাগের মাথায় করিম সাহেব হাতের ছড়িটা বসিয়ে দিলে কাসেমের পিঠে। দু'জন লোককে বললে. বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কাসেমের পিঠে চাবুক বসাতে।

সমস্ত পিঠে কালশিটে দাগ নিয়ে লতিফ সাহেবের বাড়ীতে ফিরে এলো কাসেম।

লতিফ সাহেবকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। তারপর সব কথা খুলে বললে। বললে, চাঁদবানু কোন গুনা করে নাই সাহেব।

দোষ করুক বা না করুক, করিম সাহেব ভেবে দেখলো না। রাগের মাথায় মৌলবীকে সাক্ষী রেখে তালাক দিয়ে দিলো চাঁদবানুকে।

তালাক তালাক তালাক!

চাঁদবানু কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো বাপের কাছে। লতিফ সাহেবের ছোটবিবিও শুনে চোখ মুছলো আঁচলে।

গাঁয়ের মৌলবী বললে. তা তালাক দিয়েছে করিম সাহেব ভালই হয়েছে। মেয়ের তোমার নিকা দাও সদরের কোন ভালো লোক দেখে। দু'বছর ঘর করছে করিমের. কোলে একটা বাচ্চাও দিতে পারেনি আহাম্মকটা।

লতিফ সাহেব উত্তর দিল. তালাকের ক'টা মাস যাক্‌ চাঁদির মন হয় তো সদরের আব্দুল উকিলের ছেলের সাথেই নিকা দেবো।

চাঁদবানু কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না। না হয়, বেওয়ার মতই থাকবে সে, তা বলে নিকা করবে না চাঁদবানু।

বাপ-মা বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বুঝতে চাইল না সে।

কাসেমও ভয়ে ভয়ে বললে, আব্দুল উকিলের ছেলেটাকে দেখেছি আমি। বাপের মতই বুদ্ধি ছেলেটার, তিন-তিনটা পাশ দিয়েছে...

শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠলো চাঁদবানু।

কাসেমও বুঝলো না, কি চায় মেয়েটা। এমনি বিধবার মত থাকবে নাকি চিরকাল? না কি মনে মনে করিম সাহেবকেই ভালবাসে ও! তাই হবে হয়তো!

হঠাৎ একদিন করিম সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল কাসেম। বললে, চাঁদবানুকে ঘরে ফিরিয়ে আনো করিম সাহেব, ও গুনা করে নাই কিছু। কুলোকের কথা শুনে তালাক দিলে মিছামিছি।

করিম সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ঠিক কথা কাসেম, কুলোকের কথা শুনে তোকেও শাস্তি দিলাম নিজের বুকটাও কাঁদে এখন। চাঁদবানু, তুই জানিস না কাসেম, বড় ভালো মেয়ে চাঁদবানু।

—তবে ফিরায়ে আনো না কেন?

করিম সাহেব হাসলে।—মুসলমান ঘরের কানুনটা বড়ো কড়া কানুন কাসেম, ইচ্ছা হইলেই তালাক দেওয়া বিবিকে ফিরায়ে আনা যায় না।

কাসেম বললে, মৌলবীকে বললে উপায় বাতলে দিবে।

করিম সাহেব ফিসফিস করে বললে, উপায় আছে কাসেম, তুই পারিস চাঁদিকে ফিরায়ে আনতে? তুই নিকা করে চাঁদিরে তালাক দে কাসেম। পঞ্চাশটা টাকা দেবো তোরে, 'না' করিস না কাসেম ভাই!

মৌলবীও সেই কথাই বললে।—ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তুই বাদ সাধিস না কাসেম। লতিফ সাহেবও রাজি হয়েছেন।

—আর চাঁদবানু? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে কাসেম।

মৌলবী বললে চাঁদবানু যে নিকা করলো না সে তো ঐ করিমের তরেই। নিকা হয়ে ফের তালাক না হ'লে করিমের ঘরে আসতে পাবে না চাঁদি, এ-কথা মুসলমান ঘরের কানুন, তাই রাজি হয়েছে চাঁদি।

কাসেম বললে, তবে আমিও রাজি হইলাম, কিন্তু তালাক বিক্রীর টাকা দিবেন না আমারে।

টাকাটা তো বড় কথা নয়। চাঁদিকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে কাসেম, তার দোষেই তালাক দিয়েছিল করিম সাহেব, ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তার জন্যে টাকা নেবে কেন কাসেম।

চাঁদবানুকে সব কথা খুলে বললে লতিফ সাহেব। জিগ্যেস করলে

তোর মতটা ক' চাঁদি! রাজি আছিস তো? লজ্জার হাসি হেসে মাথা নাড়লো চাঁদবানু। হাতকাটা কাসেমের সঙ্গেই নিকা হয়ে গেল চাঁদবানুর!

সত্যি এমন দিনটার জন্যে কত স্বপ্নই না দেখেছে কাসেম। কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে শুধু আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে। অথচ, সত্যিই যখন তার ঘরে এলো চাঁদবানু, কাসেমের মনটা হু-হু করে কেঁদে উঠলো। মনে হল গাঁ-সুদ্ধ লোক যেন হাসছে তাকে দেখে। বলছে, কাসেম তালাক বিক্রী করেছে। কাসেমটা চশমখোর, টাকার লোভে তালাক বিক্রী করেছে করিম সাহেবকে!

চাঁদবানুর সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতেও সাহস হয়নি। চাঁদবানুও হয়তো হাসছে মনে মনে, কাসেমের নসীব দেখে।

নিজের মনেই নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কাসেম। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল তার। চমকে উঠলো কাসেম। পায়ের ওপর কি ওটা, বেড়াল নাকি?

উঁহু। পায়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে চাঁদবানু, আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে যেন কাসেমের পায়ের ওপর।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো কাসেম।

ডাকলে, চাঁদি, অ' চাঁদি।

সশব্দে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো চাঁদবানু।

তার মুখটা এক হাতে তুলে ধরবার চেষ্টা করলে কাসেম। বললে, কি হ'ল চাঁদি, কাঁদছো কেন?

জলে-ভাসা এক জোড়া চোখ তুলে কাসেমের মুখের দিকে তাকালো চাঁদবানু। বললে, আমারে তালাক দিবে না কও!

দীর্ঘশ্বাস ফেললে কাসেম। বললে, না চাঁদবানু, দিব না তালাক, তালাক দিবো না তোমারে। ব'লে চাঁদবানুকে বুকের কাছে টেনে নিলো কাসেম। একটাই তো হাত, চাঁদবানু নিজেই যেন তার বুকের কাছে সরে এলো। কাসেম কাটা হাতটা রাখলো চাঁদবানুর মাথায়। বললে, কিন্তু নিমকহারাম কইবে সকলে, তুমার আব্বাজানের কাছেও নিমকহারাম হইতে কয়ো না চাঁদি।

বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালে চাঁদবানু। অবোধ্য ঠেকালো যেন কাসেমের কথাগুলো! ও কি কোন দিন বোঝেনি কাসেমের গোপন স্বপ্ন, না কি ও নিজেই স্বপ্ন দেখেনি!

তবু কাসেম বললে, পাটোয়ারের বিবি হবার রূপ তুমার, আমার ভাঙ্গা

ঘরে কি চাঁদরে ধরা যায়। তালাক আমারে দিতেই হবে, তুমার ভালোর জন্যেই দিতে হবে চাঁদি।

তালাক, তালাক. তালাক।

তা হোক্, গলার হার গলায় পরে খুলে দিয়েছে কাসেম। সেই স্বপ্নই তো সবচেয়ে মিঠে, কি হবে তাকে চার দেয়ালের বাক্সে ভরে রেখে।

[১৩৬২]

ভ য়

'আত্মহত্যাই করলুম। কি, এবার বিশ্বাস হ'ল তো?—অঞ্জলি'

শুধু এইটুকু। আর কিছু লেখা নেই। কার উদ্দেশ্যে তাও জানবার উপায় নেই। কেন এ আত্মহত্যা, তাও না। নীল রঙের চিঠি লেখার প্যাডের ওপর ছোট ছোট আটটি কথা। কলমের ক্যাপটা তেমনি পিছনে আঁটা, নিব থেকে এক ফোঁটা কালি বেরিয়ে ভিজে গেছে চিঠি লেখার প্যাডের একটা ধার। খানকয়েক বই টেবিলের পাশে, একটার পাতা খোলা, কিংবা পাখার বাতাসেই হয়তো খুলে গেছে। পাতলা কাগজের মলাট বইটার। বোধ হয় কবিতার।

অত খুঁটিয়ে দেখবার মত না ছিল মন, না উপায়। ফিরে তাকালাম গৌতমের মুখের দিকে. গৌতমের মুখ থেকে অঞ্জলির মুখে সরে গেল চোখের দৃষ্টি। দুটো ঠোঁট যেন চেপে বসে আছে। ম্লান বিষণ্ণ মুখ, ঘুমের মত জুড়ে আছে চোখের পাতা। ঠোঁট দুটো যেন পরস্পরকে চেপে রেখেছে—কি যেন কথা, গোপনতা—প্রকাশ করতে রাজি নয় যেন ও মুখ।

নিজেরই দীর্ঘশ্বাসে চমকে উঠলাম। তাকালাম গৌতমের মুখের দিকে। প্রথমটা যেন বিস্ময়ের চোখেই তাকালো গৌতম। বিস্ময় না প্রশ্ন? তারপর চোখ নামালো। লজ্জায় হয়তো বা।

দু'জনেই বেরিয়ে এলাম। কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না।

এই তো ঘণ্টা কয়েক আগে, বিকেল সবে শান্ত, এ পথে যেতে যেতে দেখেছিলাম। দু'একটা কথা হাসি. ঠাট্টা বিদ্রূপ, তারপর খুশী-গুনগুন মন নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। গৌতমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পথেই। কই, কোন কিছুই তো টের পাই নি। গৌতমও হেসেছিল, কথা বলেছিল হাল্কা মনেই। কিছুই কি জানতো না, কিংবা জেনেও চেপে রেখেছিল?

চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল অঞ্জলির সুন্দর শরীর। চিঠিটা হয়তো লুকিয়ে রাখলো গৌতম, আর নয়তো অঞ্জলির চিতাতেই তারও শেষকৃত্য হ'ল। কিন্তু প্রশ্নটা ভুলতে পারলাম না।

'আত্মহত্যাই করলুম। কি, এবার বিশ্বাস হ'ল তো'

—হ্যাঁ অঞ্জলি।

—গৌতমকে বিয়ে করলে তুমি খুশী হবে?

—হ্যাঁ।

—মা খুশী হবে?

—হ্যাঁ।

—বৌদি খুশী হবে?

—হ্যাঁ।

—গৌতম, গৌতম কি খুশী হবে?

—হ্যাঁ।

অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

বললাম, আর তুমি, তুমিও খুশী হবে তো অঞ্জলি?

লজ্জা পেল অঞ্জলি। বললে, গৌতম যদি সত্যি খুশী হয়—

সেদিন আনন্দ হয়েছিল অঞ্জলির কথা শুনে। ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছিলাম অঞ্জলির মাকে, বৌদিকে। গৌতমকেও।

তারপর বিয়ের দিনটাও মনে আছে। গোলাপী রঙের কাগজ কিনে রসগোল্লার সংগে পান্তুয়ার বিয়ের পদ্য ছাপিয়ে নিজের হাতে বিলি করেছিলাম বিয়ের আসরে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা বুঝি হ'ল না।

রোগ সারলো না, রোগ বাড়লো। কোথায় একটা রহস্যের দেয়াল রয়ে গেল দুজনের মাঝখানে।

দিব্যি হেসেখেলে প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে বসে, আবার হঠাৎ এক-সময় মুখ থম থম করে ওঠে, কি এক দুশ্চিন্তা খেলে যায় ওর চোখে।

—কি হ'ল, হঠাৎ এমন মেঘ থম থম করছে কেন মুখে? হেসে জিগ্যেস করতাম।

তবু হাসতো না অঞ্জলি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো, কি জানি কেমন ভয় ভয় করে।

—ভয়? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করতাম।

অঞ্জলি তেমনি ভারি গলায় বলতো, সত্যি তোমরা কিছু বুঝতে পারো না, সন্দেহ হয় না?

—কি সন্দেহ?

মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে অঞ্জলি বলতো, আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারি; আমি বোধহয় সত্যি পাগল হয়ে যাবো।

অবিশ্বাসের হাসিতে ওর সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করতাম। কখনও কখনও মনে হ'ত অঞ্জলির এ সবই ভান, কপট রসিকতা। অথচ মুখচোখ দেখে বুঝতে পারতাম না।

বলতাম, কেন এমন মনে হয় বলতো?

গৌতমও হাসতো প্রথম প্রথম।

ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠলো। মনে হ'ত ওর এই পাগল হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তাটাই পাগলামি।

হঠাৎ এক এক সময় জিগ্যেস করে বসতো, আচ্ছা, আমার চোখ দেখে মনে হয় না কিছু, সত্যি করে বলো না তোমরা। চোখ দেখে তো বোঝা যায় পাগল কি না।

হাসতেও সাহস পেতাম না। বলতাম, এতই যদি অবিশ্বাস আমাদের, চলো না ডাক্তার দেখিয়ে আসি। তাদের কথা তো বিশ্বাস হবে।

কিন্তু ডাক্তারের কথাও বিশ্বাস করলো না অঞ্জলি।

বললে, আমি তখন কত ছোট, আট বছর বয়েস। তখনই এক জ্যোতিষী বলেছিল। দেখো ঠিক মিলবে তার কথা।

অঞ্জলির মা চটে যেতেন।—মিলবে! জ্যোতিষী না ভণ্ড। তার কথা যদি সত্যি হ'ত তা হলে তোর বাবা......

অঞ্জলির বৌদিও বোঝাতেন। বলতেন, তার কথা মিললে পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হ'ত তোমার।

তবু বিশ্বাস করতো না অঞ্জলি।

শেষে গৌতমকে বললাম। একজন জ্যোতিষীর কাছেই নিয়ে চল। তার কথা শুনলে হয়তো—

কিন্তু কাজ হল না। হেসে উড়িয়ে দিলো অঞ্জলি।—এ সব জ্যোতিষী ব্যবসাদারী করে। ওরা কি জানে। ছোটবেলাতে একজন সন্ন্যাসী হাত দেখে বলে গেছে......

বলতে বলতে হঠাৎ থমকে থেমে পড়তো অঞ্জলি। বলতো, পাগল হয়ে বেঁচে থাকা যে কি দুঃসহ, কল্পনাও করা যায় না। তোমরা কিন্তু যেই বুঝতে পারবে, আগে থেকে বলে দিও। আত্মহত্যা করবো সেও ভালো। তবু...

শুনে চমকে উঠতাম। অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, অঞ্জলির হাবে ভাবে কথায় বার্তায় কোনদিন কোন অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিনি।

তাই এক এক সময় বড়ো বিরক্ত হতাম। গৌতমও বিরক্ত হ'ত, কিন্তু

প্রকাশ করতো না। পাছে অঞ্জলি ব্যথা পায়, পাছে তার মনের মধ্যে কোন ওলটপালট ঘটে যায়।

আর এই ভয়েই অঞ্জলি যখন যা জিদ্ ধরতো মেনে নিতো গৌতম।

কোন তর্ক করতো না, বোঝাতে চেষ্টা করতো না।

কখনও পুরী, কখনও দার্জিলিং।

কিন্তু ফিরে এলেই দুদিনের মধ্যে আবার শুরু হ'ত। চোখ ছলছল করে উঠতো অঞ্জলির।

জিগ্যেস করতো, পাগল বৌ নিয়ে বেঁচে থাকা বড়ো কষ্ট না?

এ কথার কি জবাব দেবো। বলতাম, অঞ্জলি, মিথ্যে কেন এ-সব ভাবো? সত্যি যদি তোমার কোন রোগ থাকতো তা হ'লে সারাবার ব্যবস্থাও তো করতো গৌতম।

উল্টো ফল হ'ল কথাটার। অঞ্জলি জিদ্ ধরলো, রাঁচিতে পাঠিয়ে দাও আমাকে, রাঁচিতে পাঠালেই সেরে যাবো আমি।

অঞ্জলির মা বললেন, তাই করো বাবা, গৌতমকে বলো, রাঁচির ডাক্তারদের কথা শুনলে হয়তো পাগলামি সারবে ওর।

ডাক্তারদের একজন শুনে হাসলেন।

বললেন, এতকাল দেখে এসেছি পাগলরা প্রমাণ করতে চায় যে পাগল নই, আর এ যে ঠিক উল্টো।

পরীক্ষা করলেন। বললেন, দুর্বল মনের লক্ষণ শুধু, কোন ক্ষতি হবে না।

—ক্ষতি হবে না? চটে গেল অঞ্জলি। বললে, দুর্বল মন বলেই তো পাগল হয়ে যেতে পারি। হয়তো আত্মহত্যা করে বসতে পারি।

গৌতমের মন বোধহয় ভেতরে ভেতরে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই রাগ চেপে রাখতে পারলো না।

বললে, বেশ পাগল হও আগে তারপর বিশ্বাস করবো, তখন ব্যবস্থা করা যাবে।

শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো অঞ্জলি।

তারপর আবার যেমন হাসিখুশি ছিল তেমনি। সংসারের কাজকর্ম করে, ঘুরে বেড়ায়, গল্প করে। মনে হ'ল, এবার বুঝি সব সন্দেহ ঘুচে গেছে অঞ্জলির। সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ভাবলাম, গৌতমের কাছ থেকে একটা কথা শুনেই বোধহয় পাগলামি

সেরে গেছে। তবু বললাম, এ ভাবে বকুনি দিস না গৌতম, কিছুই তো বলা যায় না......

গৌতমের চোখেও জল এলো।—অনেক তো সহ্য করেছি। আরো সহ্য করতে বলিস?

একটু চুপ করে থেকে বললে, একটা পুতুলকে বিয়ে করেছি আমি। বাইরে দেখতে প্রতিমার মত, কিন্তু প্রাণ নেই। সশব্দে কেঁদে উঠলো গৌতম।

তবু দেখে মনে হ'ত না ওরা অসুখী। মনে হ'ত না কোথাও কোন অসন্তোষের বীজ আছে দু'জনের জীবনে।

বিশেষ করে সেদিনটার কথা বেশ মনে আছে। বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় দেখা হয়েছিল। যাবার পথে দেখি, খিরকির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জলি।

কথা, হাসি, ঠাট্টা বিদ্রুপ।

মাঝপথেই দেখা হয়েছিল গৌতমের সঙ্গে। আপিস থেকে ফিরছিল।

জোর করে টেনে নিয়ে গেলাম আড্ডায়। ফিরেও এলাম যথাসময়ে! গৌতমও চলে গেল।

মিনিট পনেরো পরেই ছুটতে ছুটতে এলো গৌতম। বললে, শীগগির আয়।

গেলাম।

মৃত্যুর শরীরে চোখ পড়লো। চমকে উঠলাম অঞ্জলির মুখের দিকে তাকিয়ে। একটা বিস্ময়ের চিহ্ন দুলছে সিলিং থেকে, দেয়ালে তার বীভৎস ছায়া। আর অঞ্জলির দুটো ঠোঁট যেন চেপে বসে আছে। ম্লান বিষণ্ণ মুখ, ঘুমের মত জুড়ে আছে চোখের পাতা। চাপা ঠোঁট জোড়া কি যেন বলতে চায় না, কি যেন গোপন রাখতে চায়।

টেবিলে নীল রঙের প্যাডে কয়েকটা অক্ষর। খান কয়েক বই টেবিলের পাশে। একটার পাতা খোলা, কিংবা পাখার হাওয়ায় বোধহয় খুলে গেছে। কলমটা খোলা। এক ফোঁটা কালি নিব থেকে চুঁইয়ে পড়েছে কাগজে। আর নীল চিঠি লেখার কাগজে কয়েকটি মাত্র শব্দ।

"আত্মহত্যাই করলুম। কি, এবার বিশ্বাস হল তো?—অঞ্জলি"

[১৩৬২]

স হ যো গ

রেলের কলোনী। পাহাড় ফাটিয়ে টানেল কেটে এগিয়ে গেছে রেলের লাইন। জঙ্গল সাফ করেছে, জাঙ্গাল বেঁধেছে। রূপনারায়ণ আর মহানদী, কংসবতী আর মধুমাটির মত হাজারো ছোট বড় নদী। তন্বীশ্যামার শীর্ণ দেহ কোনটির, আর কোনটি বা স্তনিত তরঙ্গিণী।

অর্থলিপ্সু প্রয়োজনের মন কিন্তু রসাহরণ করতে ছাড়েনি। বিশাল-দর্শন লোহার থাম বড় বড় টি আর জয়েস্ট, য়্যাঙ্গেল আর স্টিলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে নাগরাশ্লেষী নদীর বুক। ইস্পাতের আঁট-কাঁচুলির চাপে থেমে থিতিয়ে গেছে অধীর স্পন্দন! নাগরী নদী য়্যানিকাটের জানালা দিয়ে লুকিয়ে সাগর দেখে। শাড়ীর পাড়ের মত এক জোড়া রেল লাইন ব্রিজের ওপর। এসে ঢুকেছে কলোনীর স্টেশনে।

পুবের প্লাটফর্ম থেকে দূর পশ্চিমের ওয়ার্কশপ অবধি লম্বা লাল কাঁকরের রাস্তা। খানিকটা সোজা গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়েছে একটা ভাঙ্গা পাহাড়ের গায়ে। তারপর ট্রলী লাইনের গা ঘেঁষে ঢুকে গেছে কারখানার ভেতর।

দক্ষিণ পাড়াটা অফিসারদের। এদিকটা লাল কাঁকর নয়, পিচ-ঢালা চিক্‌চিকে মেট্যাল রোড। ভোর-সকালে হোসপাইপের জলের ফুরফুরি লেগে স্নিগ্ধ আর কমনীয় হয়ে ওঠে দেওদারের সবুজ পাতা। এভিন্যু গোছের সড়ক, দুপাশে দেবদারু আর সুপুরি গাছ। অশোক আর আমলকী দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচিয়ে। স্পঞ্জের মত নরম হলদে মুচকুন্দের পাপড়ি।

শেষ দক্ষিণের সবচেয়ে বড় বাংলোখানাই কর্নেল জনসনের।

বিরাট বাগান বাংলোর সামনে। কত রকম-ধরনের ফল আর ফুল। রাঙা লতা আর রঙিন পাতা। চওড়া ফটক থেকে পর্চের নীচে অবধি একটা ছোট্ট সরু রাস্তা। নুড়ি পাথরের রাস্তাটার দুধারে ঝাউয়ের সারি। গুঁড়ির চারপাশে চক্রাকারে সাজানো মার্বেলের মালা। দিনের রোদ রুখতে দোতলার বারান্দাটায় টাঙানো থাকে সবুজ চিকের পর্দা।

বিস্তৃত বাগিচায় পাতা আছে সবুজ ঘাসের জাজিম। কাঁটাবেড়ার পাশে পাশে সাদা ধবধবে অটল অনড় ইউক্লিপটাসের গুঁড়ি। ক্রিসেন্থিমাম আর

কাঠগোলাপ। মৌসুমী ফোটে মৌসুম বুঝে। ছোট ঝরনার মত পাহাড়ী নদী পিয়ালীর ওপর কংক্রিটের সাঁকো। জনসনের জনশূন্য হারেম দেখা যায় সেখান থেকে।

এত বড় বাড়িটায় একা থাকেন কর্নেল জনসন। একা, সম্পূর্ণ একা। স্ত্রী নেই পুত্র নেই, নেই কন্যারত্ন। কোন আত্মীয় অনাত্মীয়ারও টিকি দেখা যায় নি এ বাড়িতে।

চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জনসন। কলোনীর লোকের চোখে অদ্ভুত এক গোপন রহস্য। একে ঘিরেই অনাবিষ্কৃত এক আশঙ্কার ছাপ প্রতিটি বাসিন্দার বুকে। বাবুলডিহির ডিরেক্টর এই কর্নেল জনসন।

জনসন কর্নেলের ধাপ অবধি উঠেছিলেন মহাযুদ্ধে। মেসোপটেমিয়ার এক ট্রেঞ্চফাইটে বেয়নেটের খোঁচা লেগে গলে গিয়েছিলো বাঁ চোখের তারা। লণ্ডনের একটা পাইপ য়্যাক্সিডেণ্টে জখম হয়ে ডান হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে কাধ থেকে। লোকে বলে বসন্ত, তা নয়, যৌবনের য়্যাক্নি ভাল-গারিসের দাগ সমস্ত মুখে। ডান দিকের কোটের হাতাটা লটপট করে, বাঁ চোখের ঝিমিয়ে-পড়া পাতা দুটোর মাঝখানে খানিকটা লালচে মাংস। মুখে সব মিলে একটা বীভৎসতার ছাপ রেখে গেছে।

জনসনের জরু ছিল কিনা তাই নিয়ে মাতামাতি করে বুড়োরা। অনেকের ধারণা মিসেস জনসনও ছিল একজন। সে বোধ হয় কোন আমেরিকান ডলারপতির সংগে পালিয়েছে। বাংলো-পিওন চোখেলাল নাকি দেখেছে, জনসন রোজ সন্ধ্যার সময় একগোছা ফোটোগ্রাফ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। সময়ে সময়ে তাঁর ডান চোখ বেয়ে নাকি ঝরঝর করে জল পড়ে। ওয়াগন শপের ফোরম্যান উত্তম সিং দেখেছে হুইলার থেকে সংস্কৃত গীতা কিনতে। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের গুরখা প্রহরী একজন বলেছিলো, রাতের বেলায় জনসন নাকি ছদ্মবেশে লেবার কোয়ার্টার্স দেখে বেড়ান। তাদের দুঃখ দুর্দশা ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখে ফরফরিয়ে বের করে দেন পাঁচ দশ টাকার নোট, ট্রাউজারের পকেট থেকে।

বাঁ হাতে নাম সই থেকে সাতপাতা ড্রাফট অবধি করতে পারেন জনসন সাহেব—বাঁ হাতে। বাবুলডিহির পার্কে পার্টিতে, ক্লাবে কনফারেন্সে সবচেয়ে বেশী সম্মান জনসনের। ডোরা ডরোথীদের ভয়ভক্তি সাজশ্রদ্ধা শুদ্ধ জনসনকে ঘিরে। কটা আর কালো, ট্যান কালার আর টানা চোখের চাপা বুকে যে ন্যাশনাল য়্যান্থেমের সুর বাজে, সে গানের কিং হলেন এই কর্নেল জনসন। জনসন কিন্তু নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন এসব থেকে। চার্চে তিনি

অলটারের সামনে গিয়ে বসেন। পারফিউমড চুলের সুবাসেও মুখ ফেরান না।

এ হেন কর্নেল জনসনের বাড়ি এটা।

জোর কদমে ফিরে আসছিল শিবনাথ।

জংশন স্টেশনের অসংখ্য জোড়া জোড়া লাইন গড়িয়ে গেছে। লেবেল ক্রসিংয়ের দুধারে এক্সপ্যাণ্ডেড মেট্যালের গেট। ওভার ব্রিজ দিয়ে পার হতে সময় লাগে, তাই বিপদ অগ্রাহ্য করে হেঁটে চললো শিবনাথ। মনটা আজ তার ফূর্তিতে ভরে আছে।

লম্বা কোয়ার্টারের রেঞ্জ। টালির ছাদ, খান তিনেক ঘর, জলের কল। এই ধরনের গায়ে গা লাগানো দশখানা কোয়ার্টার নিয়ে এক একটা ইউনিট। দাঁত বের করা ইটের দেয়াল, পয়েণ্টিঙের সুড়কি খসে গেছে বহুদিন। ছোট ছোট গরাদে জানালা, আর কাঠের জাফরিতে ঘেরা বারান্দা। অন্যদিন হ'লে বেকার শিবনাথ কয়েকটি বিশেষ জানালায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়াতো। আজ আর প্রয়োজন নেই, খোরাক জুটে গেছে।

গির্জেটার পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো শিবনাথ। মনে মনে রোমন্থন করছিল সদ্য দেখা ঘটনাটা। রাণীকে বলতে হবে আজই।

কোল ভিল ওঁড়াও আর মুণ্ডা, যারা মাত্র একপুরুষ হ'ল যীশুর বাণী শুনেছে মিশনারীদের মুখে, না খেতে পেয়ে টাকার মর্ম বুঝেছে এবং বুঝে অন্ধকার থেকে আলোকে এসে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তাদের জন্যে রেল কোম্পানী বানিয়ে দিয়েছে অভ্রংলিহ বনস্পতির মত এক বিরাট গির্জে। ক্রিস্টমাসের সময় ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের এই গির্জে সাজাতে কোম্পানী থেকে খরচ স্যাংশন করে বারো হাজার টাকা। অথচ, ছোট ছোট কোয়ার্টারের ফাটা ছাদে পিচ-ডামরের পটি লাগাবার জন্যে এ-বর্ষায় দরখাস্ত করলে ও-বর্ষায় আলকাতরার তুলি বুলিয়ে দিয়ে যাবে। তা হোক, গির্জেটার কোথাও নেই এতটুকু খুঁত, পুরোদস্তুর ফ্যাশনেবল।

গির্জে থেকে আশি গজ ব্যবধান রেখে শুরু হয়েছে কেরানীবাবুদের কোয়ার্টার। কয়েকটি বাঙালী পরিবার এই কসমোপলিটন আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটায়।

কি মনে করে খিড়কির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। চকিতে দেখলে শাড়ীর আঁচল দুলিয়ে কে যেন ঘরে ঢুকলো। দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকলো শিবনাথ। শব্দ শুনে ফিরে তাকালো রাণী, মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ।

চাপা স্বরে ধমক দিলো শিবনাথ।

—কোথায় গিয়েছিলে?

মুখ নামিয়ে রাণী ভাঙা ভাঙা করে উত্তর দিলে।—তেল ছিল না।

—কোথায় গিয়েছিলে, কোথায়?

—অমিতাদির কাছে। এবারেও মাথা তুলতে পারলে না রাণী।

—হুঁ। গুম্ হ'য়ে রইলো শিবনাথ কিছুক্ষণের জন্যে। সন্দেহের বিষ-বাষ্পে জ্বলে উঠলো ওর সারা শরীর।

বললে, অমিতাদি! বীরেনবাবুর শালী হবার এত শখ!

প্রতিবাদের ক্রুদ্ধ চোখে একবার চকিতে চাইলো রাণী, তারপর নিঃশব্দে নিজের কাজে চলে গেল।

মিথ্যে সন্দেহ? কে জানে! শিবনাথ নিজেকে কোন দিনই বুঝে উঠতে পারেনি। এ কি নিজেরই দুর্বলতা, না পারিপার্শ্বিকের প্রভাব? কে জানে!

বিয়ের পরও বছরখানেক বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে দু'জনে। তারপর আগমন ঘটলো এই বীরেনের। পাশের কোয়ার্টারে বউ অমিতাকে নিয়ে এসে কায়েমী আসন গাড়লো ওরা। ছিমছিমে চালাক চতুর বউ, কোন দিক থেকেই বীরেনকে অসুখী মনে করার কারণ নেই। তবু, তবু কেমন যেন একটা জাতক্রোধ গজিয়ে উঠেছে শিবনাথের মনে—রাণীকে কোনদিন বীরেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি, তবু।

প্রথম প্রথম একটা বোবাকান্নার ব্যথা পেত শিবনাথ। সন্দেহ হ'ত, অথচ বলতে পারতো না লজ্জার খাতিরে। সন্দেহটা কি সত্যিই মিথ্যে? তা হ'লে কথায় কথায় শিবনাথকে বীরেনের সঙ্গে তুলনা করতো কেন রাণী! —জানো, বীরেনবাবু বয়সে তোমার চেয়ে বড় বৈ ছোট নয়, তবু ওঁর তুলনায় তুমি যেন বুড়িয়ে যাচ্ছো। একদিন বলে ফেলেছিল রাণী।—জানো, বীরেনবাবু নাকি বি এ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন! বি এ পরীক্ষায় প্রথম তো অনেকেই হয়, বীরেনের প্রথম হওয়াটাই কি রাণীর কাছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার!—বীরেনবাবুর প্রোমোশন হয়েছে, তিরানব্বই টাকা মাইনে হ'ল, শুনেছো? বাকীটা নিজের মনেই ভেবে নিতো শিবনাথ। হয়তো রাণী বলতে চায় যে, তুমি এখনও একটা চাকরিই জোটাতে পারলে না।

কথাটা অবশ্য অন্যায় নয়। যক্ষ্মায় ভুগছেন শিবনাথের বাবা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে 'লোন' নেয়া টাকায় সংসার চলছে। শিবনাথের এবার একটা চাকরি না করলেই নয়। অথচ, চাকরি পায় কোথায় বেচারা।

নিজের ক্ষুদ্রতাটুকু যত ঢাকবার চেষ্টা করে শিবনাথ, রাণী ততই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।

শেষ অবধি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না শিবনাথ। পষ্টাপষ্টি বলেই ফেললে একদিন। রাতের অন্ধকারে রাণীর কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছিল কিনা দেখতে পায়নি সে।

—পাশের বাড়ীর সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভালো নয়। একটু কুৎসিত ভাবেই বলেছিল কথাটা। নিষেধ সত্ত্বেও আজ আবার পাশের কোয়ার্টারে যেতে দেখে তাই সন্দেহটা ঘনীভূত হলো।

সকালের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে কান্না পাচ্ছিল রাণীর। পুরুষ মানুষ মাত্রেই কি এমনি অমানুষ হয়? চোখ ঠেলে জল আসছিল ওর।

একটা টুলে বসে রুগ্ন শ্বশুরের যন্ত্রণাকাতর মুখটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল রাণী।

রাত গভীর হয়ে আসছে। দূরের গির্জেয় ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল। কারখানার চিমনি থেকে আকাশে ছিটিয়ে পড়েছে খানিকটা জাফরানী আগুনের হলকা। পৃথিবী নিঃঝুম।

মালগাড়ীর শাণ্টিং আর ইঞ্জিন-শেডের দু' একটা টুকরো বাঁশীর কাতরানি ভেসে আসে! ডেঞ্জার হুইস্‌ল্‌ আর ইস্পাতের লাইনে গাড়ীর গড়গড়ানি।

শিবনাথের বাবার অসহ্য চীৎকার। মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিলো রাণী। বুড়োর চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে ওঠে। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হয়। সজল চোখে তাকিয়ে দেখছিলো রাণী।

কাছের কোন একটা বাড়ীতে ঝন্‌ঝন্‌ করে কাঁসার শব্দ বেজে উঠলো। হয়তো হাত ছিটকে পড়ে গেছে বাটি আর ঝিনুক। ককিয়ে কেঁদে উঠলো একটা ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে। শিবনাথের ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারেই বিছানার চারপাশে হাত বাড়িয়ে রাণীর খোঁজ করলে। ধক্‌ করে উঠলো ওর বুকের ভেতরটা। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে তন্ন তন্ন করে দেখলে চারপাশ। না! কোথাও নেই। তবে কি—

হঠাৎ মনে হ'ল হয়তো বাবার অসুখ বেড়েছে। পা টিপে টিপে এসে দেখে গেল। হাঁ, রাণী বসে আছে বাবার কাছে। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। ব্যর্থতার ব্যথাও পেল একটু। যা সন্দেহ করেছিল তা মিথ্যা

প্রমাণিত হয়ে যেন ব্যর্থতা এনে দিলো ওর মনে। যদি কোন রকমে সন্দেহটা সত্যি হতো!

পা টিপে টিপে ফিরে এসে ঘুমোবার চেষ্টা করলে শিবনাথ।

বুড়ো বাপ কাশতে শুরু করেছে আবার।

পিকদানির জলটা লাল হয়ে উঠলো! ভয়ে আঁতকে উঠলো রাণী।

কাশি থামিয়ে গোঙাতে শুরু করলে বুড়ো। শ্বশুরের কষ্ট আর সহ্য হচ্ছিল না রাণীর। মুখের দিকে তাকালেই বুকটা ব্যথিয়ে ওঠে। দূরে কম্বলের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে শ্বাশুড়ী আর ননদ। তাদের দিকে এক চোখ তাকিয়ে নিয়ে পিকদানিটা সাফ করতে বেরিয়ে গেল রাণী। একটু পরেই পিকদানিটা রেখে দিয়ে শিবনাথকে ঠেলে ওঠাতে গেল পাশের ঘরে। সকলে ঘুমিয়ে আছে, কেমন যেন গা ছমছম করে, ভয় করে।

বার কয়েক ঠেলা দিতেই শিবনাথ চোখ চাইলে।

—কি ঘুম বাপু তোমার!

—তা বলে কি রাত জেগে আমাকেও মরতে হবে নাকি। খেঁকিয়ে উঠলো শিবনাথ। ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেল রাণী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, যাও ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।

—ফি দেবার টাকা আছে? তুমি বরং যাও, তোমার চাঁদ মুখ দেখলে হয়তো মন গলতে পারে রাজেন ডাক্তারের।

রাণী চটলো না। বললে, যাও লক্ষ্মীটি একবারটি যাও আজ। তোমার পায়ে পড়ি।

উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো শিবনাথ।

পাশের কোয়ার্টারে দুনিয়ার দুঃখ ভুলে ঘুমোচ্ছিল বীরেন আর অমিতা। একজোড়া লিকলিকে সাপ যেন নরম লেপের উষ্ণ আস্বাদে আত্মহারা। বাইরের বিঘ্নে তাদের আরামনিদ্রা ভাঙে না।

এত আরামের গোড়ায় আছে তিরানব্বই টাকার চাকরি। মাসের শেষে টাকা ক'টা রীতিমত উপার্জন করে বীরেন। তিন বছর আগে তিরিশ টাকায় ঢুকে তিরানব্বই টাকায় প্রোমোশন পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ফূর্তিতে আর ফুরসতে কাটিয়ে দেয় বারোমাস। অমিতার নীল চোখের তারায় তারায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। খুশীয়াল রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খিলখিল করে হেসে ওঠে যখন অমিতা, মনে হয় পৃথিবীতে বাস করার কায়েমী দাবী আছে যেন একমাত্র ওদেরই।

হয় না তবু শিবনাথের। এমনিই তো তৃষ্ণার্তা চাতকীর মত খাঁচার ফাঁকে চোখ রাখতে দেখলে আশঙ্কা হয়, সন্দেহ হয় রাণীর ওপর।

কিন্তু অদ্ভুত একটা মোহ ক্রমশ যেন গ্রাস করে ফেলেছে শিবনাথকে। ক্ষণিকের দর্শনে তৃপ্তির স্তিমিত অভিব্যক্তি ফোটে তার চোখে। পাওয়ার আনন্দে এতদিন সে যেন বুঝতেই পারেনি যে কিছুই পায়নি সে। স্তোকবাক্যের কুয়াশায় তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলো রাণী। কত সহজ সারল্য অমিতার কথায়, অমিতা কত সুন্দর।

এ বাসা ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছা হয় না শিবনাথের। অথচ উপায় নেই। প্রায় এক মাস হ'তে চললো বাপ মারা গেছে, বাসা ছাড়ার নোটিশ আসবে এইবার। উঠে যেতে হবে নতুনবাজারের দিকে। বাপের উপার্জনের উচ্ছিষ্টতে বেশী দিন আর চলবে না। চাকরি চাই। বোন সুকুমারী এবার পনেরোয় পা দিয়েছে।

অমিতার লোভনীয় আকর্ষণ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু যাওয়া ভালো, বীরেনের কাছ থেকে রাণীকে দূরে রাখতে হবে।

মদের নেশা ছাড়া যায়, কিন্তু দেখার নেশা ছাড়া যায় না।

ভোর হতে তখনও কিছুটা বাকী। হাল্কা পায়ে এগিয়ে চললো শিবনাথ। কর্নেল জনসনের রহস্যপুরীর দিকে। জনসন—বাবুলডিহির ডিরেক্টর জনসন। যার একটা কলমের খোঁচায় আটশ টাকা বেতনের অফিসারের চাকরি বরখাস্ত হয়ে যায়, খেয়ালের মাথায় যে ষাটকে সাতশ' করতে পারে, কামধেনুর মত যা কিছু মঞ্জুর করতে পারে যে। বাবুল-ডিহির উই-পিঁপড়েগুলোও জানে, উপকার না হোক, অনিষ্ট কতখানি করতে পারে চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জনসন। কোন্ সাত সাগরের নীচে পাতালপুরীর গুপ্তগৃহে পড়ে আছে অজস্র মণিমুক্তা চন্দ্রহারের হাট, তার গোপন সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেয়েছে শিবনাথ। বহুদিন থেকেই দেখে আসছে। কিন্তু ঐ বীভৎস-দর্শন দৈত্যটাকে তার বড় ভয়।

গন্তব্যে পৌঁছে গেল শিবনাথ। পিয়ালী নদীর বুকে কংক্রিটের সাঁকো। পাশেই সিমেণ্টের বেদী। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লো শিবনাথ। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জনসনের বাড়ীর দোতলার বারান্দার দিকে।

অপেক্ষা করতে করতে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠলো।

নদী পিয়ালীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশে উঠে গেল এক জোড়া জলপিপি। একটা মাছরাঙা ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাক ছাড়লো। কুলকুল করে পিয়ালীর জল বয়ে চলেছে। ক্ষীণ-স্রোতা জলের আঘাত লেগে জল-তরঙ্গের বোল ফুটছে নুড়িপাথরের মুখে। ভোরের রুপালী আলোয় মাছের আঁশের মত চিকচিক করছে করোগেটেড স্রোত।

পেছনে চাঁদমারির ময়দান অন্ধকারের বোরখা তুলে ধরেছে। একটা বিরাট ঢিবির ওপর সারি দিয়ে সাজানো কতগুলো টিনের চাকতি। এক দুই তিন অজস্র নম্বর লেখা রয়েছে তার গায়ে। সাহেব বাচ্চারা টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করে এই শুটিং গ্রাউন্ডটায়।

ভোরের আলো রঙিন হয়ে ঠিকরে পড়লো ময়দানে। স্বচ্ছতোয়া পিয়ালীর সলিলস্রোত সোনালী হয়ে উঠলো। স্পষ্ট হয়ে উঠলো ময়দানের ওপরে গথিক ছাঁদে গড়া বাড়ীখানা। এখানকার বিচারালয় ছিল ওটা এককালে, এখন রাজবন্দীদের আটক রাখা হয়। ওদিকে তাকালেই ভয়ে বুকটা দুলে ওঠে শিবনাথের। এই বনেই নাকি কপালকুন্ডলার দেখা পেয়েছিল নবকুমার। বঙ্কিমের কাপালিক আজও বেঁচে আছে। অপশক্তির সামনে আজও রয়েছে নরবলির রেওয়াজ।

চোখ ফেরালো শিবনাথ। কর্নেল জনসন ঐ দোতলার বারান্দাতেই শুয়ে থাকেন। এখনও ওঠেন নি, নেটের সাদা মশারিটা তোলা হয়নি এখনও। পিতলের পালঙ্ক গিল্টির চমক দিচ্ছে। তৃষ্ণাতুরের মত তাকিয়ে রইলো শিবনাথ। অনেক দেখেছে, আজও দেখবে সে।

একদিন দেখেছে, ফোড়েদের একটি মেয়েকে।

ছত্রিশগড় নাগপুরের রোদে তাতানো মেয়ে। উস্কুখুস্কু চুল, রাত্রির চাঞ্চল্যে। কপালে উল্কির টান, টানাটানা চোখ। রসোদ্দীপ্ত যুবতীদেহ। একখানা মোটা লালপাড় দেহাতী শাড়ী সুপুষ্ট দেহের নিম্নভাগ থেকে ওপরে উঠেছে ঘোরানো সিঁড়ির মত। দেহের প্রতিটি লোলুপ বক্র। দোতলার বারান্দায় বিদ্যুৎ-আলোর স্পর্শ লেগে অপরূপ মনে হয়েছিল তাকে। নিরাশঙ্ক অকুণ্ঠিতার মতই সদর্পে হেঁটে বেরিয়ে এসেছিল মেয়েটি। তারপর মৃদু সুরে কি একটা হিন্দী গান ভাঁজতে ভাঁজতে রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিল।

আর একদিন দেখেছে শিবনাথ।

হাল্কা ঢেউ খেলানো চুল। বব্‌ ছাঁটা সোনালী রঙের চুল। কানে স্যাফায়ারের দুল। গলায় কোরালের মালা। লাল সিল্কের ঢিলে গাউন

সুরমণি ডাকলো, আপুং।

বাপ লাটুয়া ওঝা সাড়া দিলো।

মরিয়ম আর ঠিকেদার আত্মীয়টি এবার ওদের ভাষাতেই বোঝালো ব্যাপারটা।

আর সুরমণি এক মুখ হেসে বললে, আপুং বাংলা জানে গো বটে।

লাটুয়া ওঝাও হাসলো সে-কথা শুনে। অন্ধ দুটি চোখ মেলে কি যেন দেখবার চেষ্টা করে বললে, বসেন বাবুরো।

সুরমণি এগিয়ে এলো, দেখতে চাইলো কুকুরে কামড়ানো দাগগুলো। তারপর লাটুয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে রাখলো ক্ষতটার ওপর। বেশ টের পেলাম, থরথর করে কাঁপছে বুড়ো। আনন্দে, না আশঙ্কায় বোঝা গেল না।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাটুয়া ওঝা বললে, বিশ নখুনে বিষ, আঠারো নখুনে পানি।

কিছুই বুঝতে পারি নি দেখে সুরমণি ব্যাখ্যা করলো। অর্থাৎ কুকুরটার চার পায়ে যদি বিশটা নখ থাকে তাহলে বিষ আছে। আর তা না হ'লে জল।

সঙ্গী আত্মীয়টি জানালেন, ক'টা নখ তা তো দেখিনি।

অন্ধ লাটুয়া হাসলো সে-কথা শুনে। দুটো হাত আন্দাজে আন্দাজে কি যেন খুঁজলো।

—ডুডাং নিখা? প্রশ্ন করলো সুরমণি।

ঘাড় নাড়লো লাটুয়া। সুরমণিও ওপাশে গিয়ে বসলো।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম এক কোণে অসংখ্য ছোট বড়ো কৌটো, হাঁড়ি, মাটির সরা।

তারই ভেতর থেকে সুরমণি একটা কৌটো এগিয়ে দিলো লাটুয়াকে।

লাটুয়া বললে, ইটা ডুডাং গাছের মূল। চন্দন আর ডুডাং ঘষে তিন দিন লাগাবি কত্তা। বিষ আখন বুকে উঠছে, ডুডাং লাগালি মাটিতে ঝইরবে।

শিকড়টা হাত বাড়িয়ে নিলাম। সুরমণি খানিকটা ঘষতে শুরু করলো। দেখিয়ে দেবে কি করে লাগাতে হয়।

শিকড় ঘষার শব্দে লাটুয়া হেসে বললে, আমার মায়েটাও বড়ো ওঝাঁ কত্তা, সব ঝাড়ফুঁক শিখ্যে' লয়ছে।

শুনে লজ্জার হাসি হেসে মুখ লুকোলো সুরমণি, মাথা হেঁট করে কাজে মন দিলো।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আর কি ওষুধ আছে তোমার কাছে?

বুড়ো হাসলো আমার কথা শুনে। বললে, আমার নাম লাটুয়া ওঝা। সকল রোগের দাওয়া আমার ঘরে।

বুড়ি এতক্ষণ হুঁকো টানছিল, সেটা নামিয়ে রেখে বললে, ডাটু সাইবের কথাটা ক'ইয়ে দাও উদের।

—হুঁ ডাটু সাহেবের কথাটা। মাথা নাড়লো লাটুয়া। তারপর আবার দুটি অন্ধ চোখ মেলে কি যেন হাতড়াতে শুরু করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কৌটো এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া কৌটোটা খুলে সামনে ধরলো।

বললে, ইটা কুশি্ট পাথর। নাগবংশী পূজা করে পাইছিলাম। শুনো তবে কথাটো। ডাটু সাহেবেরে সাপে কাঁটলো সিবার। খবর পাইয়া ছুইটলি। কুশি্ট পাথরটা গাড়ার জলে ধুইয়ে লাগায় দিলি সাহেবের গোরে, সাপে কাটছিলো যিখানে। মন্তর পড়লি। পাথরটা লাইগা রইলো তবু। ফের মন্তর পড়লি পাথর তবু ঝর‍্যে না। তেজী মন্ত্র পড়লি, পরে পাথর ঝরলো, সব বিষ মাটিতে ঝর‍্যে পড়লো।

সুরমণি বললে, আর আপাংটো?

—হুঁ, ঐ আপাংটো। আবার দু'হাত কি যেন খুঁজলো।

একটা মাটির সরা এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া বললে, ই হ'ল আপাং। কাঁকড়া বিছার যম বটে। মুনশীবাবুর বাচ্চারে কাটছিলো বিছায়। আপাং লাগায়ে মন্তর পড়লি, মাথার বিষ চোক্ষুর পানি হ'য়ে ঝইরা গেল।

লাটুয়ার থুথুরে বুড়ি হুঁকোটা আবার তুলে নিয়ে বললে, আর মাংরী মুরমুর উদ্‌রী?

—হুঁ। মনে পড়লো লাটুয়ার, অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে ফেলে দুটি হাত তার বাতাসে ঘুরে বেড়ালো।

সুরমণি আবার মাটির হাঁড়ি এগিয়ে দিলো লাটুয়া ওঝার দিকে। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি দেখা দিলো তার মুখে।

বললে, উদ্‌রীটো শয়তানী রোগ কত্তা, পট্টিতে উ শয়তান ঢুইকলোন তো পট্টি সাফ হ'য়ে যাবে। ত' সিবার মাংরী মুরমুর বাপটো ছুট্যে আঁয়লো। বুড়া কান্দে তো বুড়ার মায়া কান্দে। তো দিইলাম ই

কোঁকড়াইনের চক্ষু আর উদ্‌রী গাছের থাম। গাঁ ছাইরে ভাগলো শয়তান। বলে হাঁড়িটা দেখালো লাটুয়া।

সুরমণি আবার কি একটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিলো, বললাম, আজ চলি, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আবার শুনবো একদিন এসে।

সম্মতি জানালো লাটুয়া। বললে, ডুডাংটো তিনবার কইরে লাগাইবি কত্তা। আর তিনদিন পরে আবার আইসবি।

সুরমণিও এলো চবুতরা অবধি। বাইরের আলোয় এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওকে। দেখলাম রূপ আর দারিদ্র্যের হাত ধরাধরি। যৌবন আর অলজ্জতা।

কাপড় নয়, এক টুকরো নোংরা গামছা সুরমণির কোমরে। কিন্তু কালো পাথরের এমন নিটোল মূর্তি এর আগে দেখি নি। কোন অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতে গড়া নিখুঁত একটি যৌবনবতী নারীদেহ।

পাশাপাশি হেঁটে এলো সুরমণি, আর ওর সমস্ত শরীর ঘিরে যেন নাচের ছন্দ বাজলো।

সুরমণি হাসলো হঠাৎ।

বললে, তুয়ারে আগেই দেখছি আমি। মেন্ছায়েবের সাথে মারাং গাড়ায় বঁইসেছিলি ওদিন।

—আর তোর সঙ্গে কে ছিল? হেসে প্রশ্ন করলাম।

—উ আমার ঠিগিয়া পুরুষ বটে, বাপলা হবে উয়ার সাথে।

দুটি রুপোর টাকা গুঁজে দিলাম ওর হাতে। ডুডাং শিকড়ের দাম। তারপর দ্রুত পায়ে কোয়ার্টারের পথ ধরলাম।

কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হ'ল। দেখলাম, তেমনি দুটি বড়ো বড়ো কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে সুরমণি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় চুলের জট, কিন্তু স্বাস্থ্যের জোয়ার তার লাবণ্য ছিটানো মুখে। আর বুকের উদ্দাম তরঙ্গের মাঝখানটিতে দুলছে লাল পুঁথির হার। কানের লাল কুণ্ডল দুটো জ্বলছে রক্ত পলাশের মত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এলাম। সুরমণির স্মৃতি নিয়ে।

ঠিকেদার আত্মীয় ছুটলেন সুতপার এলসেশিয়ান কুকুরটির নখের সংখ্যা গুণতে। বিশ নখুনে বিষ, আঠারো নখুনে পানি। বলেছে লাটুয়া ওঝা।

শুনে ডাক্তার সেন হাসলেন। বললেন, সব বুজরুকি। ও'রাও মুণ্ডা সাঁওতালরা একদিন ডাক্তারের নাম শুনলে মারতে আসতো, আজ হাসপাতালে

ভিড় দেখবেন চলুন। লাটুয়ার ওষুধে কাজ হ'লে ওরা আর আমার কাছে আসতো না।

কম্পাউন্ডারবাবু হেসে বললেন, ওসব ছেড়ে দিন, রাঁচিতে ফোন করে বারোটা ইনজেকশন আনিয়ে নিন।

বন্ধুনী শুধু ভয়ের চোখে বললেন, না না। উল্টো বিপত্তি হতে পারে ইনজেকশন নিতে গিয়ে...সে আমি দেখেছি, আধ হাত লম্বা ছুঁচ, পেটে দিতে হয়। তার চেয়ে কুকুরটা পাগলা কিনা দেখাই যাক না।

ভয় যে আমারও কম ছিল তা নয়। তাই সুতপার কথাতেই সায় দিলাম।

বললাম, সাঁওতালী ওষুধে এমন সব কাজ হয় যা ভাবা যায় না।

ঠিকেদার আত্মীয়টি ইতিমধ্যে ফিরে এসে জানালেন, বিশও নয়, আঠারোও নয়—উনিশটি নখ কুকুরটার পায়ে।

আর ডাক্তার সেন বললেন, ওসব ছেড়ে দিন। পাগলা কুকুরের কামড় বড়ো ভীষণ জিনিস। নিজের চোখে দেখেছি। জ্বর হবে, ভয়ে চীৎকার করে উঠবে অনবরত। জল দুধ তেল যা দেখবেন মনে হবে কুকুর তাড়া করে আসছে—জলাতঙ্ক রোগ বড়ো ভীষণ রোগ। ছ' মাস পরে হয়তো জানা যাবে কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না, দশ দিনের মধ্যে সব শেষ।

বন্ধুনী ধমক দিলেন।—কেন ভয় দেখাচ্ছেন মিছিমিছি। কুকুরটা যদি দশ দিনের মধ্যে মারা যায়, তবে তো বুঝবো পাগলা কুকুর।

ডাক্তার সেন সায় দিলেন, হ্যাঁ তা ঠিক্।

সুতরাং লাটুয়া ওঝার চিকিৎসাই চললো। আর তিনদিন পরে যেতে বলেছিল বলে আবার ভুরকুণ্ডার সারনা পার হয়ে এসে দাঁড়ালাম লাটুয়া ওঝার চবুতরার ঢেঁকিটার পাশে।

ডাকলাম সুরমণিকে।

কোন উত্তর পেলাম না।

বারকয়েক ডেকেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন ঝাঁপি খুলে আমি আর মরিয়ম ভিতরে ঢুকবো কিনা ভাবছি, হঠাৎ দেখি এক কলসী জল নিয়ে ফিরছে সুরমণি। গাড়ায় স্নান সেরে আসছে মনে হল। সারা শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে. আর মুখে খিল-খিল হাসি।

—দূর থেঁকে দেইখ্যা ভাবলি খাদানের বাবু বটেন। ছুট্টে আসছি বাবুরে দেইখ্যা।

বলে আরো এক মুখ হেসে ঝাঁপি খুলে ধরলো সুরমণি।

ভেতরে ঢুকলাম।

লাটুয়া বসে বসে ঝিমুচ্ছিল।

বললাম, বিশও নয়, আঠারোও নয়। উনিশ নখের কুকুর।

শুনে আতঙ্ক দেখা দিলো লাটুয়ার মুখে চোখে।—পাপ্পী কুকুর বটে। সুর্মাগিয়া শয়তান আছে উয়ার বিষে।

বলে তেমনি অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে রেখে দু' হাত বাতাসে কি যেন খুঁজলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌটো তুলে ধরলো সুরমণি।

বিড় বিড় করে কি এক মন্ত্র পড়লো লাটুয়া, তারপর বললে, ইটা কাঁটাকি গাছের মূল বটে। তিনদিন লাগালি সুর্মাগিয়া বিষ খায়ে নিয়ে ভাগবে শয়তানটো।

সুরমণি শিকড়টা নিয়ে ঘষতে শুরু করলো আগের মতই। আর লাটুয়া বলতে শুরু করলো কোন রোগ কি দিয়ে তাড়িয়েছে ও।

বললে, নাগবংশী পূজা দিয়ে জড়ি পাইলি আমি। খাদানে সাপ উঠলো সিবার, কাম বন্ধ কইরে দিলো কুলিরা।

অন্ধ লাটুয়ার হাত দুটো কি যেন খুঁজলো। খুঁজলো সাপের জড়ি। সুরমণি সঙ্গে সঙ্গে একটা মোড়ক তুলে ধরলো। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি হাসলো লাটুয়া।

বললে, কুলিদের হাতে বাইন্ধে দিলাম জড়িটো, খাদান থেকে সাপ পালায় গেল। ম্যানেজার সায়েব দশটা রুপেয়া দিলি বখশিশ।

মরিয়ম হেসে বললে, হাঁ বাবু, খাদান আপিস হর মাসে দু' রুপেয়া বখশিশ দেয় ওঝারে।

কথা শেষ হতেই বুড়ি মনে পড়িয়ে দিলো, আর মাঝিনদের কথাটো।

—হুঁ। মারাং গাড়ায় সিবার মাছ মিললো না। সান্তালরা ভাবলো বটে পাপ হইছে, তাই মাছ মিলছেক না। তো আমি কইলাম...

ওষুধটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল নিয়ে বললাম, আজ উঠি, সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আবার আসবো।

লাটুয়া প্রথমটা অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ, তিন দিন বাদে নূতন মূল দিব কত্তা।

বাইরে বেরিয়ে এলাম, সুরমণিও এলো।

আগের মতই হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, সুরমণি, কি করে চলে বলতে তোদের? আর কেউ আসে ওষুধ নিতে?

মাথা নাড়লো সুরমণি। চোখে মুখেও কেমন যেন বিষণ্ণতার ছাপ পড়লো তার। না, কেউ আসে না আর লাটুয়া ওঝার কাছে।

—তবে?

চোখ ছলছল করে উঠলো সুরমণির।

বললে, আধা বিঘান ক্ষেতি আছে, আমি আর জংলো চাষ কইর‍্যা চালাই বাবু।

লজ্জার হাসি হাসলো সুরমণি। আর কৌতুকে হেসে উঠলো মরিয়ম। বোঝালে জংলোর সঙ্গে নেপা মিলানা হয়েছে ওর। পীরিত হয়েছে।

সুরমণি লাজুক হেসে বললে, হুঁ ঠিগিয়াটোও হ'য়েছে বাবু।

অর্থাৎ বাপ্‌লাও ঠিকঠাক। তাই দু'জনে মিলে চাষ করে, আর সেই অন্নেই লাটুয়া আর লাটুয়ার বুড়ির দিনগুজরান হয়।

বললাম, লাটুয়া এত বড়ো ওঝা, ওর কাছে আসে না কেন সান্তাল রুগীরা?

শুনে চোখ ছলছল করে উঠলো ওর।

তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললো সুরমণি। বললে, তুই ডাক্তারের কাছে যা বাবু, ডাক্তারের কাছে যা। ই দাওয়াতে কাম হবেক নাই তুর।

বলে আমার হাতখানা চেপে ধরে টাকা দুটো ফেরত দিতে চাইলো সুরমণি।

বললে, ইটা ফিরায়ে লে বাবু, কাম হবেনা তুয়ার, ই দাওয়াই মিছা বটে।

সুরমণি হঠাৎ যে এমন কথা বলতে পারে ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

টাকা দুটো দিতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই নিলো না ও।

বললে, আমার পাপ হবে রে বাবু, ই রুপেয়া দুটো তু ফিরিয়ে লে।

তারপর একে একে সব কথা বলে গেল সুরমণি। এতদিনের গোপন কাহিনীটা সহানুভূতির ছোঁয়াচ পেয়ে প্রকাশ করে ফেললো।

সব ছিলো লাটুয়া ওঝার। সব রোগের ওষুধ জানতো ও। ডাইনী যুগিন তাড়াতে পারতো সাপের বিষ ঝাড়তে পারতো। নাগবংশীর পুজো দিয়ে সব শিখেছিল লাটুয়া ওঝা।

তারপর বুড়ো বয়সে জঙ্গলে মূল খুঁজতে খুঁজতে নাকি রাত হয়ে গেল একদিন।

পাগলের মত ও তখনও একা একা কি একটা গাছের মূল খুঁজছে। খেয়াল করে নি, কখন একটা ভালুক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরেছে ওকে।

জান বেঁচে গেল. কিন্তু ভালুকের থাবার ঘায়ে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল লাটুয়ার।

তখন থেকে আর ঘরের বাইরে যায় না ও। কিন্তু গাছের মূল তো আর চিরকাল থাকে না, কবে শেষ হয়ে গেছে সে সব ওষুধ। আর সে সব গাছের নামও জানে না কেউ, চেনেও না।

বুড়ো বাপ দুঃখ পাবে বলে আজেবাজে যা পেয়েছে ঘাস পাতা শিকড় নিয়ে এসে কৌটোগুলোয় সাজিয়ে রেখেছে সুরমণি।

রুগী না এলেও রোজ বসে বসে গল্প করে লাটুয়া, কোন ওষুধে কি কাজ হয়, কোনটা কাকে দিয়েছিল। আর ভাবে, ওর কাছে শুনে শুনে সুরমণিও বড়ো ওঝানি হয়ে উঠবে।

কিন্তু লাটুয়া তো জানে না যে সে মূল শেষ হয়ে গেছে। জানে না, চোখ ফিরে পেয়ে গাছগুলো চিনিয়ে না দিলে সুরমণি কিছুই শিখতে পারবে না। তাই দিনের পর দিন শুধু গল্প শোনে সুরমণি। আর গল্প শুনতে শুনতে চোখ ঠেলে কান্না আসে ওর।

তাই রুগীরাও কেউ আসে না আর, লাটুয়া ওঝার ওষুধে কাজ হয় না বলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়।

সব কথা খুলে বললো সুরমণি।

বললে, তু ডাঁক্তারের কাছে যায়ে দাওয়াই নিবি বাবু, ই মূল লাগায়ে কাজ হবে নাই।

দীর্ঘশ্বাস লুকোতে পারলাম না। দেখলাম দু'চোখ চকচক করছে মরিয়ামেরও।

মরিয়ম ফিরে আসার পথে বললে, মেন্ছায়েবকে বলে জংলোর একটা কাম ঠিক করে দে বাবু। কাম না পেলে উরা বাঁচবে নাই। লাটুয়া ওঝার মায়াটা মরবে, বুড়িটো মরবে, লাটুয়াও বাঁচবে নাই!

কিন্তু লাটুয়া কি সত্যিই বেঁচে আছে? ফিরে আসতে আসতে বারবার প্রশ্ন জাগলো মনে।

[১৩৫৯]

আ দি ম   ক ন্যা

ছায়া ছায়া গলির মোড়ে তখনো গ্যাসবাতিটা জ্বলে ওঠেনি। আলো-জ্বালানে লোকটা কাঁধের মই নামিয়ে থেমেছে আরো দূরের ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে।

শহর গোধূলির ধোঁয়া ধোঁয়া সাঁঝ-আঁধারের বাতাসে ভাসে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ময়দার আঠা আর কাঁচা ডিমের মত গন্ধ আসছে কাগজের স্তূপ থেকে। গলির দু'পাশের ঘর থেকে দু'একটা টুকটাক আওয়াজ, ভাঙা কথার রেশ। ওপাশের বকে বসে চা ফিরি করছে লোকটা। লোহার উনোনে বসানো কলসী থেকে এনামেলের মগে চা ঢেলে দিচ্ছে।

সুলেমানদের ঘবের সামনে একটা ফিটন। বোরখায় সারা অঙ্গ ঢেকে কে যেন নামলো, সরাসরি গিয়ে ঢুকলো অন্দবে। পিছনে কাঁচ বয়সের মেয়েটা। মাথায় উঠেছে একটু, একটু বা মোটা। আব চোখে ফুটেছে পিপাসা। প্রথম চোখেই দেখে চিনলে ইসমাইল। আর রাবেয়াও চোরা চাউনিতে এপাশ ওপাশ দেখে নিচ্ছিল। ইসমাইলের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঝুপ করে ফেলে দিলো বোরখাটা। তারপর মায়ের পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো।

মগের চা চোখে দেখলো না ইসমাইল কম দিলো কি বেশি। একটু তরু পায়েই ফিরে এলো দপ্তরিখানায়।

খবরটা দিলে সবাইকে।—সকিনাবিবি ফিরে এলো। ছোট্ট আধো-অন্ধকার ঘরের গুমোটে হঠাৎ যেন এক দম্‌কা তাজা বাতাস খেলে গেলো। একফালি চিকচিকে আলোর রোশনাই। কেউবা ফর্মা ভাঁজছিল, কেউ বা ফুঁড়ছিল জেলের সুতি। জুসের জমিতে ছুঁচ ফুটলোনা, ছাঁটাই মেসিনের হাতল ঘুরলো না আর।

ওরা জন বারো লোক।

—এলো?

—হাঁ। সাকিনাবিবি আর রাবেয়া।

ওদিকে কে হাতের গঁদ মুছে রেখেছিলো, বাবুজান তাড়া দিলো, তো কি, কাজকাম বন্দ রইবে?

দম্ নিয়ে কাজ শুরু হ'ল আবার। ঘোর কাটলো আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'লো চোখাচোখি কথা। হাসি, ইশারা. ইঙ্গিত।

বাঁধা বইয়ের ছাঁট দেয়া শেষ করে বাবুজান বললে, জল্দি হাত চালাও, রাত দশটা নাগাদ ডেলিভারি দিতে হবে না?

হাত তো চলছেই, জবাব দেবে কেন!

জবাবের আশাতেই হয়তো একটু অপেক্ষা করলে বাবুজান। তারপর বললে, পানি খেয়ে আসি।

ইসমাইল হাসলে। আর সকলেও।

ওদিক থেকে কে ফোড়ন কাটলে, পিয়াস পানির না—পিয়ারীর?

দ্বিতীয় দফাতেও সেই এক ফল হলো। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরতে হলো সাকিনাবিবিকে। তালাক নিয়ে। প্রথম দফায় সাত মাসের মধ্যেই হয়েছিল বিবি থেকে বেওয়া। রাবেয়াকে তবু কোলে পেয়েছিল। বারো বছর পরে ইজ্জত খুইয়ে বিয়ে করলে—হ্যাঁ ইমানদার মাশুকই তো মনে হয়েছিলো তাকে—কিন্তু দুটো বছরও কাটলো না। বড় ভাই সুলেমানের কাছে ফিরে এলো আবার।

ভাবীকে বললে হামেদসাহেবের ছেলের সঙ্গে রাবেয়ার সাদি দোব না আমি। বলে দিয়েছি সে কথা।

সে কি! ফিরোজাবিবি আশ্চর্য না হয়ে পারলো না।—আলিমলোক হামেদসাহেব, কায়েমী ঘর!

সাকিনা বললে, না ভাবী. লক্ষ্ণৌয়ের লোক—এই তোমাকে ইশাদী রেখে বলছি, রাবেয়ার সাদি দোব না আমি সেও ভালো। কথা শেষ হ'ল না, কেঁদে ভেঙে পড়লো সাকিনা।

ফিরোজা তবু গায়ে মাখলে না কথাটা। লক্ষ্ণৌ আর আগ্রা—ও তো আগ্রার মেয়ে। বাঙালীঘরে নিজেকে বেশ তো মানিয়ে নিয়েছে ও।

কাঁদতে দিলো ফিরোজা, তুলে ধরলে না সাকিনাকে, সান্ত্বনা দিলো না। অনেক পরে বললে, বাবুজান আজকাল খুব বড়ো কারবারী হয়ে উঠেছে, জানো? তিনটে কুঠি নিয়েছে. বারো-চোদ্দটা লোক খাটে।

সাকিনার উত্তর না পেয়ে আবার বলে, রাবেয়া তো ওর কাছে আসমানের চাঁদ, পেলেই লুফে নেয়।

—উঁ হুঁ। সাকিনা মাথা নাড়ে।—তিনটে বিবি ওর ঘরে।

—তো কি ঐ কসবীগুলোর সঙ্গে এক কদর হবে নাকি রাবেয়ার?

গন্ধ আর গোলাপ এক কিস্মত? চাঁদ আর চেরাগ এক জলুস?

সুলেমানও সেই কথাই বলে। বাবুজানের চেয়ে ভালো পাত্র কোথায় আর? আর অমন জোয়ান চেহারা ক'জনেরই বা আছে।

সাকিনা উত্তর দেয়, রাবেয়া আমার বাচ্ছা মেয়ে।

—বাবুজানের ওমরটাই বা কি এমন বেশী?

সাকিনা উত্তর দেয় না। অর্থাৎ রাজি নয়।

সুলেমান এদিকে বাবুজানকে বলে, ঘাবড়াও কেন! সবুর করো, সবুর করো।

—না, মানে ইসমাইলটা আবার বাচ্চা বয়েস থেকে একসঙ্গে খেলা-ধুলো করেছে রাবেয়ার সঙ্গে, কবে কি করে বসে।

সুলেমান হাসে।—বাবুজান, আমার ঘরে আলো ঢুকতে পায় না। আর রাবেয়াকে চেনো না তুমি। ভাবছো কেন, দুদিন সবুর করো।

বাবুজান বলে, আচ্ছা। কিন্তু সবুর করতে করতে চুলে কলপ লাগাবার দিন না এসে যায়।

সুলেমান হাসে।—আরে তুমি তো কাঁচ্চা জোয়ান এখনো?

এ ও তা পাঁচ কথার পর সুলেমান বলে, তা আমার ঐ ছাঁটাই মেসিনটার কি করলে? দাও না একটা কিনে, মাসে মাসে দশ কিস্তিতে শোধ করে দোব।

বাবুজান বলে, কারবার খাড়ছে, একসঙ্গে হাজার টাকা দেয়া! তা দোব দোব আর মাস কয়েক পরে। সবুর কর একটু।

সুলেমান বুঝতে পারে। মনে মনে বলে, বেইমান। মুখে, বাবুজানকে নয়, বিবি ফিরোজাকে বলে, সাকিনাকে বলে দাও রাবেয়ার সাদি দেবে কি না ও। আমারও একটা ইজ্জত আছে, সাকিনার আক্কেল না থাকতে পারে। আখেরে আফসোস করতে হবে।

ফিরোজা বলে, আমাদের আরজি ওর কানে পেঁছিয় না।

—কিন্তু লোকে যে বদনাম রটায় তা আমার কানে পেঁছিয়।

পুরোনো কাঁচামাটির বাড়ি সুলেমানের। বাবুজানের মত পাকা দালান ভাড়া নেবার টাকা নেই ওর। তাই জল আনতে যেতে হয় তিনটে বস্তির ঘর ডিঙিয়ে। কাছেই রাস্তার মোড়ে আছে সরকারী জলকল। কিন্তু রাবেয়া বড়ো হয়েছে, সেই সে আগের দিনের কিশোরী বয়েস। আর বিয়েরও চলছে কথাবার্তা, আজ না হোক দু'দিন পরেও

তো হবে। পাড়াপড়শীর কে কি খ্‌ুঁত ধরবে, দরকার কি মোড়ের কলে জল আনতে যাওয়ার। তার চেয়ে আজম চাচার টিউবওয়েল ভাল। ব্‌ড়ো আজম চাচার বাড়ীতে মরদ তো নেই কেউ।

তা না থাক স্‌লেমানের চোখ এড়িয়ে বাঁশের চিকবেড়ার আড়ালে এসে হাজির হয় ইসমাইল। আজম চাচার চোখে ছানি, চোখ ঝাপসা।

—কি রাবেয়া, বাব্‌জানকে মনে লাগলো নাকি? শ্‌নছি তুমি নাকি মত দিয়েছো সাদির লেগে?

রাবেয়া ট্‌করিয়ে হাসে। চোখের ফাঁকে ঝিলিক ছিটিয়ে বলে, আ কথা। দিনেরাতে ঐ এক দ্‌ঃস্বপন লেগেই আছে নাকি আঁখির কোণে?

—তা। তোমার মতো দিল্‌ জখম করার জাদ্‌তো মাখাই না, না স্‌র্মা।

ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসে রাবেয়া। একট্‌ ছেলেমান্‌ষি, একট্‌ স্‌খ উৎস্‌ক। বলে, কবিয়ালের মত কথা কও যে, রোবাই বাঁধছো নাকি?

এপাশে ওপাশে চিকের আড়াল, শ্‌ধ্‌ চট করে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে ওপরের বারান্দাটা। না কেউ নেই। সবে কলসীটা নামিয়ে রেখেছে রাবেয়া, আর ঝট্‌ করে তার হাত ধরে একটান মারলে ইসমাইল। তাল সামলাতে না পেরে ওর ব্‌কের ওপর এসে পড়েছিল রাবেয়া, নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, কি করো!

ইসমাইল হেসে আরো কাছে টানতে চায় ওকে।

রাবেয়া কপট ক্রোধে বলে, শরম লাগে না তোমার? যাও আপন কাজে যাও। এখানে কেন?

ইসমাইল হেসে বলে, যাই। কাজে নয়, স্‌লেমান সাহেবের কাছে। বলবো রাবেয়ার সাথে আমার সাদি দাও, আর, নয়তো ভাগবো আমরা দ্‌'জনে।

রাবেয়া ঠোঁট উল্টে বলে, ইস্‌। ঘর নাই, তার ঘরণী হবার সাধ নেই আমার। বাব্‌জানের মত দালান কোঠা আছে তোমার? বিয়ার দিনে আতশ জ্বালতে পারবে. কিংখাব কশীদার জামদানি দিতে পারবে বাব্‌-জানের মত? সানাই বাজাতে পারবে?

ইসমাইল বলে, বেগম ঘরে এলে বাদশা বনতে কি? সব্‌র কর দ্‌'দিন. দেখবে।

—হ্‌ঃ, একটা চাঁদির চুটকি দিতে পারে না, হীরে জহরত।

ইসমাইল বললে, সব্‌র করো না দ্‌দিন।

ম্‌খে সব্‌র করতে বললেও কাজে ইসমাইল রয়ে-সয়ে চলতে চায় না।

সুলেমানের কাছে কথা পাড়ে। আর সাকিনাবিবির সঙ্গেও খুঁজে পেতে কি একটা সম্পর্ক বের করে বলে, রাবেয়াকে বিয়ে করবো।

সুলেমান বলে. পড়শীর সেরা সুরতের মেয়ে রাবেয়া, তোমার মত নালায়েকের সঙ্গে বিয়ে দেব আমি? রোজগার নেই একপয়সা—

সাকিনাবিবি কিন্তু মনে মনে পছন্দ করে বসে আছে ইসমাইলকে। আধা বুড়ো বাবুজানের চেয়ে ভাল। কপাটের আড়াল থেকে তাই সুলেমানকে বলে, ইসমাইলকে কও যে এ তো খুশির কথা। ওর সঙ্গেই বিয়া দোব রাবেয়ার।

সুলেমান চটে যায়।—ঘর নাই কুঠি নাই। বেকার।

প্রতিবাদ আসে ভিতর থেকে।—উঠতি ওমর, খোদা দিলে বাবুজানের চেয়ে দশদফা বেশী রোজগার হবে।

মীমাংসা আর হয় না। ফিরে আসতে হয় ইসমাইলকে, সেই এক কথা শুনে, সবুর করো।

রাবেয়া অত বোকা মেয়ে নয়।

সুলেমান বোঝালে. মোহব্বতে মন ভরে, পেট ভরে না। কি আছে ইসমাইলের? বস্তির নোংরা ঘর একখানা। আর বাবুজান? বেগম-আদরে রাখবে। সোনা-চাঁদিতে মুড়ে দেবে রাবেয়াকে।

রাবেয়া বুঝলো কি বুঝলো না, কে জানে। কিন্তু না বললে না। বিয়ে হয়ে গেল তার বাবুজানের সঙ্গেই।

বিয়ের পরেও বেশ খেয়াল খুশী। আর, আরো তিনটি বিবি থাকলে কি হবে, বাবুজান ওর প্রেমে পড়েছে। অমন টাকাওয়ালা লোক, আর বয়েসও কত! তবু, লোকটা যেন রাবেয়ার কথায় ওঠে আর বসে। যখন যা বলে, রাবেয়াকে খুশী করতে তর সয় না যেন। অথচ, আর তিনটে বিবি ভয়ে জড়োসড়ো। খাটছে বাঁদীর মত মুখ বুজে। আর জামিয়ার জামদানি, চুমকির চমক খেলে রাবেয়ার হাসির তালে তালে। বাজু তাগা, কঙ্কণ কানপাশা কি দেয়নি রাবেয়াকে।

প্রথমবার স্বামীর ঘর থেকে যখন ফিরলো রাবেয়া, সাকিনাবিবি ভেবেছিল মেয়ের চোখে জল দেখবে। কিন্তু! খুশী হ'ল সাকিনা। মেয়ের মন বসেছে নতুন ঘরে। দিন-রাত কথায় কথায় ও বাড়ীর খবর।

—আম্মা! চাঁদির পেয়ালায় চা খাই আমি। রাবেয়া হাসে।

ফুটে উঠেছে, পাখা মেলেছে যেন গুলবাহার বাগিচা। কামনাতুর আশ্লেষে ভেঙে পড়তে চাইলো রাবেয়া।

কিন্তু রাবেয়ার আলিঙ্গন আকাঙ্ক্ষী হাত দুখানা সরিয়ে দিলে ইসমাইল।

শ্লেষের হাসি মাখিয়ে বললে মাতোয়ালীর মতো আদব দেখাও যে! ফিরে যাও রাবেয়া, তুমি বাবুজানের বিবি। আমার কাছে বেগানা জেনানা।

আহত সাপিনীর মত চোখের দৃষ্টিতে বিষ ছড়ালে রাবেয়া!

বললে মুনিবকে ডর পাও বুঝি?

—নিমকহারাম নই আমি।

—আর আমার মোহব্বতের ইনাম বুঝি এই?

ইসমাইল হাসলে।– মোহব্বৎ আর আশনাই এক নয়।

রাবেয়া তবু এগিয়ে এলো।

ইসমাইল বললে, ফিরে যাও রাবেয়া। আর নয়তো বাবুজানকে ছেড়ে চলে এসো। তোমার জন্যে জান দিতে পারি আমি, জাল মোহব্বতের জন্যে নয়। তুমি ফিরে যাও।

রাবেয়া তবু নড়লো না।

ইসমাইল উঠে এলো। রাবেয়ার হাত ধরে ওকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে বললে আজ যাও রাবেয়া। তোমার মোহব্বৎ যদি সাচ্চা হয়, গিয়ে বলে ফেল বাবুজানকে। তালাক নিয়ে এসো, তোমাকে নিকা করে চলে যাবো আমরা এখান থেকে। যাও।

ব্যর্থতায় নুয়ে পড়লো রাবেয়া। ইসমাইলের কাছ থেকে এমন আঘাত পাবে বুঝতে পারে নি। ...া হলে! ওর মদো রক্তে বিধাক্ত হাসি খেলে গেল। নিকা? কি আছে ইসমাইলের? না চাঁদি, না চুমকি।

তর তর্ করে হেঁটে চললো ও। রাগে জ্বলে উঠলো দু'চোখ। অন্ধকার রাতের রাস্তায় গ্যাসবাতির ছায়ায় দুলতে দুলতে এসে থামলো বাবুজানের বাড়ীর সামনে।

বাবুজানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে উঠলো রাবেয়া।

আশ্চর্য! হঠাৎ ফিরে এলো কেন রাবেয়া? সাকিনাবিবি কি ওকে কিছু বলেছে? না সুলেমান তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে?

—কি হয়েছে রাবেয়া?

রাবেয়া আবার কেঁদে উঠলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

বললে, ঐ বেয়াদবটা—ঐ চশমখোর, বেইমান ইসমাইল বেইজ্জত করেছে আমাকে। হাত ধরে টেনেছে ও আমার। আবার কেঁদে মুখ লুকোলো রাবেয়া।

স্বস্তির নিশ্বাস নিলো বাবুজান। তাপযন্ত্রের পারা নেমে গেল রাবেয়ার মন থেকে। একি ভুল করে ফেলল ও!

বাবুজান বললে, সবুর করো বিবিজান, ও আহম্মকের বন্দোবস্ত করছি।

বাবুজানের দিকে তাকিয়ে ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে রইলো রাবেয়া। মুখে ভয়ের হাসি।

[১৩৫৬]

যুবতী ধরম

এক একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে যার ফলে একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে, ভোলা যায় না। অন্ধকারের মধ্যেও তাই চিনতে পারলাম।

রাত তখন ঘন হয়ে আসছে। পার্কে যারা সান্ধ্যভ্রমণের নামে চিনে-বাদাম চিবোতে আসে তারা তখন ফিরতি মুখে। যুবকমন যাদের দেখে ঈর্ষা বা উল্লাস প্রকাশ করে সেই সব সুখী দম্পতিরাও তখন পরিবারের অনুপস্থিত আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে যাবতীয় দ্বিধা দ্বেষ দ্বন্দ্ব উদ্গীরণ করে পুনরায় ধোঁয়াটে মন নিয়ে বাসায় ফিরে চলেছে। এ সময়টায় পার্কের ঘাসে কিংবা কাঠের বেঞ্চিতে লোকজন খুবই কম দেখা যায়।

বেঞ্চিটা দূর থেকে মনে হয়েছিল খালি আছে। কাছে আসতেই টের পেলাম, কে যেন বসে রয়েছে। পিঠ দেবার জায়গাটায় হাত রেখে এবং হাতের ওপরে মাথা রেখে যে বসেছিল, প্রথমটা মনে হয়েছিল সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে তাই এক পাশে, একটু দূরত্ব রেখেই বসে পড়লাম। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে লোকটা। আহা ঘুমোক! পাছে ঘুম ভেঙে যায় তার, এই ভয়ে, দেশলাই জ্বালবো কিনা সিগারেট ধরাবার জন্যে, ভাবছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

মনে হল, ভদ্রলোক যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কান পেতে শুনলাম। হ্যাঁ, কান্না। নিশ্বাসের শব্দেই কেমন যেন কান্নার আভাস।

চুপ করে বসে রইলাম। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, উঠে পালাতে পারলেই যেন ভালো হয়। একবার আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে আমাকে একবার দেখে নিয়েই আবার হাতে মুখ গুঁজলেন ভদ্রলোক।

বলেছি না, এক একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যে একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধে হয় না।

মুখ তুলে মুহূর্তের জন্যে তিনি তাকালেন আমার দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেদিনের দৃশ্যটা।

কেমন যেন রহস্য রহস্য ঠেকলো। প্রায় ছ-ফুট লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সে প্রৌঢ়ই বলা চলে. মুখে বসন্তের দাগ থাকলেও সুশ্রী বলা যায় এমন ধরনের মুখশ্রী। কিন্তু এমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ চেহারার মানুষ যে কাঁদতে পারে, বিশেষ করে পার্কের নির্জন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে, তা কোনদিন কল্পনাও করিনি। বরং প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল ও'র মত সুখী মানুষ বুঝি ভূভারতে নেই।

দুপুরবেলায় আপিস থেকে বেরিয়েছি এক বন্ধুর সঙ্গে, কাছের ইস্কুলটায় বন্ধুপুত্রের জন্যে একটা সীটের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। ইস্কুলে তখন বোধহয় টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। হৈ হল্লা ছুটোছুটি করছে ছেলেগুলো সামনের রাস্তায়। হঠাৎ একখানা গাড়ি শব্দ করে এসে থামলো।

সঙ্গে সঙ্গে একদল বাচ্চা ছেলে ছুটে এলো গাড়িটার কাছে।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, স্টিয়ারিং ছেড়ে গাড়ি থেকে নামলেন ভদ্রলোক। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন অফুরন্ত হাসি লুকিয়ে ছিল।

গাড়ি থেকে নেমেই পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপাল মুছলেন তিনি, তারপর রুমালটা পাদানির ওপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। একরাশ ছেলে তখন ঘিরে ধরেছে তাঁকে। তিনিও হাসতে হাসতে কি যেন বলছেন।

কাজ সেরে ইস্কুলের আপিসঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখনও তিনি গল্প করতে করতে বাঁ হাতের কৌটো থেকে টফি বের করে বিলি করছেন।

থামতে হল। কোলকাতা শহরে এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না। পকেটের পয়সায় টফি কিনে এনে অপরের ছেলেকে খুশী করছেন—এ কেমন ধারার নির্বুদ্ধিতা।

ভদ্রলোক ততক্ষণে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেছেন। হাতের তাস উধাও করা, টফির টিনটা তখনই খালি, তখনই টাকায় ভর্তি, রুমালের রঙ লাল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে সাদা—এমনি নানান কলাকৌশল দেখিয়ে একসময় উঠলেন তিনি।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন টিফিন-শেষের ঘণ্টা পড়তেই।

কিন্তু ছেলের দল তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না গাড়িটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিন সত্যিই রহস্যজনক মনে হয়েছিল তাঁর ব্যবহার। মনে হয়েছিল মানুষ খুব বেশি সুখ এবং সচ্ছলতার মধ্যে বোধহয় স্বার্থশূন্য হয়ে অপরকেও খুশী করতে চায়।

তখন তো জানতাম না।

জানতাম না, সেই মানুষই কিনা অন্ধকারে পার্কের বেঞ্চিতে বসে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অথচ কেন এই নিঃশব্দ কান্না তার হদিস খুঁজে পেলাম না।

তবু চুপচাপ বসে রইলাম। উঠে যেতেও মন চাইলো না।

খানিক পরেই মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। সহজ হয়ে। আমার দিকে দু-একবার ফিরে তাকিয়ে বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করলেন, তাঁর গোপন কান্না আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিনা।

পার্কে বেড়াতে এসে কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো বসে থেকেছি কোন অপরিচিতের পাশে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করতে, কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি কোনদিন। এটা কোলকাতা শহর। একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসার অধিকার আছে, পাশের লোকের শান্তি ভঙ্গ করে এক মনে পাগলের প্রলাপ বকে গেলেও আপত্তি করা যাবে না, কিন্তু অপরিচিত লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তা অভদ্রতা!

পার্কটা তখন রীতিমত নির্জন হয়ে উঠেছে। সামনের গাছটার ডালে পাখা ঝটপট করছে কয়েকটা পাখি। আর পার্কের চারপাশের গ্যাসবাতি-গুলোও কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ। শুধু ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল থেকে থেকে।

উঠবো কিনা ভাবছিলাম।

হঠাৎ ভদ্রলোক হাসলেন। —আশ্চর্য হয়েছেন, তাই না?

চমকে ফিরে তাকালাম।

বললাম, না না। আশ্চর্য হবো কেন?

উত্তর এলো, দোষ নেই আপনার। হঠাৎ পার্কে বসে বসে কাউকে কাঁদতে দেখলে আমিও হতাম।

সান্ত্বনা দেবার স্বরে বললাম, সকলের জীবনেই দুঃখ আছে।

হাসলেন ভদ্রলোক অন্ধকারেও মনে হল, সে যেন হাসি নয়, কান্নারই

নামান্তর। বললেন, ভগবান দুঃখ দিলে সহ্য করা যায়, কিন্তু......কথা শেষ হল না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।—আরেকদিন দেখা হবে।

একটা রহস্যের ছায়া যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্ধকার থেকে আলোর ভিড়ে মিশে গেল। মনের মধ্যে জেগে রইলো একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের উত্তর না জেনে শান্তি নেই যেন, স্বস্তি নেই। ভেবেছিলাম, আর বুঝি দেখা হবে না কোনদিন। জানতে পারবো না, কি এমন দুঃখ গুমরে মরে এই বলিষ্ঠ শরীরের গোপন মনে।

কে জানতো টফি বিলি করার অভ্যাস তাঁর নিত্যদিনের। কে জানতো আবার দেখা হবে!

বন্ধুর ছেলেটিকে সেদিন বৃন্দাবন মিত্তিরের গলির ইস্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল।

গাড়িটা ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতেই নমস্কার করে বললাম, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?

ভদ্রলোক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, মাপ করবেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

বললাম, পার্কের বেঞ্চিতে আলাপ হয়েছিল......

দু-হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা মুঠো করে ধরলেন ভদ্রলোক। —আপনি? আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার......

উপকারটা যে কি বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। সেদিনও যারা ভিড় করে এলো, তাদের হাতে টফি দেওয়া শেষ করে বললেন, আজ আমার কাজ আছে, আজ আর ম্যাজিক দেখানো হবে না। কাল দেখাবো, কেমন?

বলেই আমাকে টেনে তুললেন গাড়িতে।

সার্কুলার রোডের ওপর একখানা বিরাট বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে নামলাম। দরজা খোলাই ছিল। তোয়লে কাঁধে বেয়ারাটা বসবার ঘর খুলে দিতে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, না রতন, ওপরেই বসবো।

মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের শোবার ঘরে উঠে এলাম তাঁর পিছনে পিছনে।

ঘরে ঢুকেই দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ছ-সাত বছরের ছোট্ট একটি ছেলে আর ন-দশ বছরের একটি মেয়ে। ভাইবোনে

গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালজোড়া এত বড় অয়েল পেণ্টিংটা দেখেই কেমন সন্দেহ হল।

মনে হল, ছেলেমেয়ে দুটির মৃত্যুই হয়তো ভদ্রলোকের দুঃখের মূল। আর সেইজন্যেই হয়তো বৃন্দাবন মিত্তিরের গলিতে ছুটে যান প্রতিদিন। শিশুর ভিড়ে নিজের দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেন হয়তো।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বললেন।

বসলাম। তারপর দেয়ালের চারপাশে তাকিয়ে আরেকখানা ছবি খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না।

ভদ্রলোক হঠাৎ অয়েল পেণ্টিংটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, আমার ছেলে আর মেয়ে। আচ্ছা, এদের দেখেছেন কোথাও?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, সে কি, হারিয়ে গেছে নাকি?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার!

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, বার বার এ-কথা কেন বলছেন, কোন উপকার তো আমি করি নি।

—করেছেন। আপনি জানেন না কি দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছি আমি। আপনি সেদিন সান্ত্বনা না দিলে . .

খানিক থেমে বললেন, সেদিন আমি আত্মহত্যা করতাম, আত্মহত্যার জন্যেই তৈরী করেছিলাম নিজেকে। সত্যি, এক-এক সময় মানুষ যে কত বোকা হয়ে যায়... .

চুপ করে রইলাম। এ-কথার প্রসঙ্গে বলবার মত কথা খুঁজে পেলাম না।

দেরাজ থেকে একটা শিশি বের করলেন ভদ্রলোক। দেখিয়ে বললেন, আত্মহত্যাই করতাম, কিন্তু আপনার কথা শুনে জীবনের ওপর মায়া হ'ল, ভাবলাম ....

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আয়নার টেবিলের দেরাজ খুলে একখানা অ্যালবাম নিয়ে এসে বসলেন।

—এই—আচ্ছা একে দেখেছেন কোথাও? দেখেননি কখনও?

অ্যালবামটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। অপরূপ এক সুন্দরীর ফটোগ্রাফ। কোলে একটি ছোট্ট শিশু, আর

হাঁটু জড়িয়ে ধরে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে, এমন রূপময়ী মাতৃমূর্তি চোখে পড়ে নি কখনো। শিশির ভেজা নিষ্কলঙ্ক একটি পদ্মের মত রূপ।

বলে দেওয়ার প্রয়োজন হ'ল না। বুঝলাম, ইনিই ভদ্রলোকের স্ত্রী।

অ্যালবামটা নিয়ে আবার পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, আমার স্ত্রীর ছবি, আমার ছেলে, মেয়ে।

ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভাবলাম, স্ত্রী হয়তো মারা গেছেন, তাই এমন হয়ে গেছেন উনি শোকে দুঃখে।

হঠাৎ মৃদু হাসি দেখা দিল ও'র মুখে। কান্নার মতই দেখাল হাসিটা।

বললেন, মেয়েদের মন...আপনি জানেন না, বারো বছর একসঙ্গে থেকেও কোনদিন বুঝতে পারিনি ও অসুখী ছিল। হঠাৎ একদিন বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এলাম ক্লান্ত শরীর নিয়ে। আসবার সময় দু'খানা সিনেমার টিকিট কিনে এনেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম. সমস্ত বাড়ি ফাঁকা। একটুকরো চিঠিও রেখে যায়নি সে। ভাবতে পারেন আপনি? বারো বছর ধরে যাকে ভালবেসে এসেছি, বারো বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও যার ভালবাসায় সন্দেহ করার কোন কিছু খুঁজে পাইনি, হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ফিরে এসে যদি শোনেন সে চলে গেছে...

বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল ভদ্রলোকের। ঘাম মোছার ভান করে রুমালে চোখ মুছলেন।

—প্রথমে ভেবেছিলাম. হয়তো বেড়াতে গেছে। কিংবা দোকানে কোন জিনিস কিনতে। চাকর দারোয়ান কেউ কিছু বলতে পারলো না। অপেক্ষা করে রইলাম সে-রাত্রি। পরের দিন আত্মীয়স্বজন চেনা-জানা সকলের কাছে চিঠি লিখলাম। তারপর, তারপর ভয় হল, ভাবলাম......হ্যাঁ, পুলিসেও খবর দিলাম শেষকালে। হাসলেন ভদ্রলোক।

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, খোঁজ পেলেন না?

—না। ছ' মাস পরে একখানা চিঠি পেলাম শুধু। তিন লাইনের চিঠি। লিখেছে. 'যাকে ভালবাসতাম, ভালবাসি, তার সঙ্গেই চলে এসেছি। আমাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টায় নিজেকে কষ্ট দিও না।'

আহত বোধ করলাম। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, সত্যি, মেয়েদের মন......

হাসলেন ভদ্রলোক। বিষণ্ন হাসি। বললেন, দুঃখ তার জন্যে নয়।

স্ত্রীর দুঃখ আমি ভুলতে পেরেছি। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে দুটি...

দু' হাতের ওপর মাথা গুঁজে সশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক। আর সে কান্না দেখে আমার নিজের চোখও যেন ছলছল করে উঠল। বুকের ভেতর কেমন একটা দুঃসহ ব্যথা অনুভব করলাম।

চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় মাথা তুললেন ভদ্রলোক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেদিন কেন কেঁদেছিলাম জানেন? যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেছে তার দুঃখে নয়, ছেলেমেয়ের জন্যেও নয়...

--তবে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, সেদিনই প্রথম খোঁজ পেয়েছিলাম ওদের। জানতে পেরেছিলাম, আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেই চলে গেছে। খোঁজ পেয়েই ছুটতে ছুটতে গেলাম তার কাছে।

—তারপর?

—বললাম, আমি আর কিছু চাই না, শুধু ছেলেমেয়ে দুটিকে দাও। ওরা আমার সন্তান, আমি মানুষ করবো ওদের।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন, যে স্ত্রীকে বারো বছর ধরে ভালবেসে এসেছি, যার ভালবাসায় কোনদিন সন্দেহ করিনি, তার চোখে সেদিন যে ঘৃণার দৃষ্টি দেখলাম, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ও ভাবলে, বুঝি ওকেই ফিরিয়ে আনতে চাই। তাই পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো, বললে, আইনের জোরে নিয়ে যেতে চাও আমাকে? কিন্তু জেনে রাখো তা তুমি পারবে না। তার আগেই আত্মহত্যা করবো আমি, তবু তোমার কাছে ফিরে যেতে পারবো না।' হাসলাম তার কথা শুনে, ছেলেমেয়ে দুটিকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলাম, তারা ভয়ে মায়ের আঁচল জড়িয়ে রইল, কিছুতেই আসতে চাইলো না। আপনিই বলুন, তারপরও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হবে না?

উত্তর দিতে পারলাম না। কি উত্তর দেব এ-কথার। কি সান্ত্বনা দেব এ দীর্ঘশ্বাসের।

ভদ্রলোক হাসলেন, বোধ হয় আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করেই।

বললেন, আপনি যেচে সেদিন সান্ত্বনা না দিলে হয়তো আত্মহত্যাই করতাম। কিন্তু তারপরই মনে হল, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করে লাভ নেই। প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো মনে। ভাবলাম, ও যেমন আমার জীবন নষ্ট করেছে, ওকেও তেমনি সুখী হতে দেবো না। সেদিন

আমার স্ত্রীকে সামনে পেলে আমি খুন করতাম। এমন কি ছেলেমেয়ে দুটোকেও হয়তো...

বললাম. খুন করে বসলেও দোষ দিতাম না আপনার।

হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না।

—প্রয়োজন হবে না? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন। পরক্ষণেই হঠাৎ সচেতন হয়ে আমার দিকে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টে মামলা করলাম। বললাম, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাই না, চাই শুধু আমার ছেলে মেয়ে দুটিকে। আইন আমার পক্ষে, ওরাও জানে আমার ছেলে আর মেয়েকে আমি ফিরে পাবো। তাই--

পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। একটুকরো কাগজ বের করলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, সতী-সাধ্বী স্ত্রীর চিঠি। লিখেছে, ছেলে-মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে না ও! লিখেছে, ওর সব দোষ ক্ষমা করে আমি যেন ওকেও ফিরিয়ে নিই। ব'লে হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম, মুহূর্তের ভুলের জন্যে তাঁর সমস্ত জীবনটা নষ্ট করবেন না। তাকে ফিরিয়ে আনুন আপনি।

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন. না, কক্ষণো না। তা হতে পারে না। ওকে আমি শাস্তি দিতে চাই. সমস্ত জীবন তার দুঃখময় করে তুলতে চাই আমি। আপনি জানেন না, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভোলা যায়, প্রেম ভালবাসা মুছে ফেলা যায় মন থেকে, কিন্তু সন্তান-স্নেহ যে কি, না হারালে বুঝবেন না। তাকে শিক্ষা দিতে চাই...

বলে স্থির হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। তারপর স্ত্রীর চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

আর একটা নিঃশব্দ নিশ্চুপ অস্বস্তির মধ্যে বসে থাকতে হ'ল আমাকে। তারপর এক সময় বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আসবার সময় শুধু বললেন, আবার আসবেন।

বললাম, আসবো।

কিন্তু মনে মনে জানতাম. এ অস্বস্তিকর পরিবেশে স্বেচ্ছায় আর কোনদিনই আসবো না।

যাইও নি আর কোনদিন।

জানি না তাররপর কি ঘটেছে। জানি না স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছেন কি না। কিন্তু এটুকু জানি. ছেলে আর মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না তাঁর স্ত্রী। এ অসহ্য অতৃপ্তির চেয়ে হয়তো বা আত্মহত্যাই বরণ করবেন।

যে যাই বলুক, যৌবনের ক্ষণিক মোহে পথ হারালেও যৌবনের ধর্ম হ'ল সন্তান-স্নেহ।

বহুবার ইচ্ছে হয়েছে এই বিচিত্র ভদ্রলোকটির জীবন নিয়ে গল্প লিখতে। সামান্য একটু কল্পনার রঙ মেশালে হয়তো ভালো গল্পও একটা লেখা যায়। কিন্তু অসত্যের কালিমা মাখিয়ে তাঁর চরিত্রকে বিকৃত করতে ইচ্ছে হয় না, সাহিত্যের খাতিরেও না।

[১৩৬২]